প্যাংগং সো, লাদাখ - আলোকচিত্রী- রত্নদীপ দাশগুপ্ত

বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

~ ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা - বৈশাখ ১৪২৪ ~

শব্দ-অক্ষরের গভীরে মায়া থাকে, মায়া থাকে চলার পথের বাঁকে বাঁকে। এই দুই মায়া জড়িয়ে গাঁথা হয় ভ্রমণকাহিনির ছন্দ। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মতই ভ্রমণকাহিনিকেও বুঝতে গেলে তাকে অনুভব করতে হয়। ওই যে বিভূতিভূষণ বলে গেছেন, 'দেখে চোখ আর মন'। ওই যে প্রসন্নময়ী বলেছিলেন, একজন সারা পৃথিবী ঘুরেও 'ইষ্টক আর প্রস্তর ছাড়া' কিছুই দেখতে পেল না হয়তো।

ভ্রমণকাহিনি নিয়ে বাঙালিকৃত বিভিন্ন গবেষণার কাজের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে মনে হয় যে এই সব গবেষকেরা সত্যিই লেখাগুলির মধ্যে ইষ্টক আর প্রস্তর ছাড়া কিছুই দেখতে পাননা। যে ইষ্টক ও প্রস্তর কাজে লাগে তাঁদের বিদ্যার ডিগ্রি এবং পকেটের অর্থের পরিমাণ আরও আরও গেঁথে তুলতে। না আছে এঁদের ভাষার ওপর দখল, না রসবোধ। ইংরেজিতে যে কাজ হয়েছে, তার যতটুকু পড়েছি, একেবারেই ভিন্ন, তাঁরা কিন্তু চোখ আর মন দিয়েই দেখেন।

এযাবত যে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাসের রেকর্ড ছিল তাতে জানা যায় ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখা 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' বাঙালি মেয়ের লেখা প্রথম ভ্রমণ কাহিনি, ভ্রমণ পুস্তক, প্রথম বিদেশ ভ্রমণ কাহিনি। অর্থাৎ বাঙালি মেয়ের লেখা ভ্রমণকাহিনির ইতিহাস শুরুর কাল ১৮৮৫। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কাব্যে তা শুরু হয় ১৮৬৪ এবং গদ্যে ১৮৭২ সালে। তাহলে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় যে ১৮৭০-এর দশক থেকে বাঙালি মেয়েরা পুরোদমে ভ্রমণ কাহিনি লিখতে শুরু করেন। গাংচিল থেকে প্রকাশিত 'আমাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত'-এই এ তথ্য প্রথম উদ্ঘাটিত করি। অথচ খুব সম্প্রতি কাগজের পাতায় দেখলাম একজন বিদগ্ধ গবেষিকার কাজ হচ্ছে বাঙালি মেয়ের ভ্রমণ কাহিনি নিয়েই। সময়সীমা কী আশ্চর্য ১৮৭০ থেকে শুরু! অথচ কাজটি করার দাবি তাঁর একার। এমনকী কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তার আলোচনা প্রকাশিত হয়ে যায়, যেহেতু এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে ভারত সরকারের একটি দপ্তরের অনুদান। আশ্চর্য লাগে যখন দেখি হাতের কাছে পাওয়া কিছু লেখা, কিছু বই নিয়েই ছাত্রছাত্রীদের শ্রমে কেমন গবেষণার পর গবেষণা, ডিগ্রির পর ডিগ্রি হচ্ছে। দুঃখ লাগে মূল রচনার বদলে যাওয়া পুনঃপ্রকাশে। এই গবেষিকারই এক ছাত্রী আমায় ফোন করে জানতে চেয়েছিল মুকুল পত্রিকা হাতে গরম কোথায় পাওয়া যাবে? এরই নাম গবেষণা! আমি তো জানি একটা লেখার সন্ধানে পায়ে হেঁটে, বাসে-ট্রেনে চড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, একটি লেখার সন্ধানে লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিতে, বাড়িতে বাড়িতে, পুরনো স্কুল বা প্রতিষ্ঠানের দরজায় দরজায় মাথা খুঁড়তে হয়। অবশ্য নাম বাড়ানোর দৌড়ে যাঁরা নাম দিয়েছেন, এত সময় কোথায় তাঁদের? সত্যিই তো, তাঁরা তো আর আমার মতো মূর্খ নন।

দুঃখ লাগে, ক্ষোভ জমে একজন ভ্রমণকাহিনিকার হিসেবে। ভ্রমণগবেষকরা ভ্রমণকাহিনিকার হতে চান না। কারণ আমরা বা আমাদের লেখা তাঁদের কাছে 'সাবজেক্ট'। এ আরেকজন গবেষিকার মন্তব্য। আমরা কিন্তু খুঁজে নিতে পারি পুরনো ভ্রমণ কাহিনি, যত্ন করে পুনঃপ্রকাশ করতে পারি তার। লিখতেও পারি তাদের বিবর্তনের কথা অনুভবের গভীর থেকে চোখ আর মন দিয়ে। গবেষকদের কাছে তাই বিনীত অনুরোধ, আমাদের ভুল ইতিহাস, অর্ধ ইতিহাস লেখার থেকে বিরত হন। বিরত হন আমাদের শুধু 'সাবজেক্ট' ভাবা থেকেও।

আমাদের ইতিহাস আমরা নিজেরাই লিখে নিতে পারব।

'আমাদের ছুটি'-র সাত বছরে পা দেওয়ার প্রাক্কালে বিনিপয়সার এই আন্তর্জাল পত্রিকার পক্ষ থেকে ভ্রমণলেখক-পাঠক-আলোকচিত্রীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পাশে থাকার জন্য।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

ঢাল বেয়ে গাড়ি নেমে আসে জলের কাছে। কোথাও তার রঙ নীল। কোথাও বা খানিক ঘন হয়ে সবুজ হয়ে এসেছে। জলের আয়নায় মুখ দেখছে পাহাড় আর মেঘেরা।

- ধারাবাহিক ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র - লাদাখ পর্ব-এর তৃতীয় পত্র দময়ন্তী দাশগুপ্তের কলমে

~ আরশিনগর ~

আবার সমুদ্রে - তপন পাল

অচিন দ্বীপ মৌশুনী - অনিরুদ্ধ ভৌমিক

আম্রুয়া মুলুকে - সৌনিপ সোম

~ সব পেয়েছির দেশ ~

বিনসারের জঙ্গলে – সুদীপ্ত ঘোষ

মায়াবী মেনমেচো – সুপর্ণা রায় চৌধুরী

~ ভুবনডাঙা ~

হো চি মিনের ভিয়েতনামে – রাইসুল সৌরভ

অল রোডস লিড টু রোম – শ্রাবণী ব্যানার্জি

~ শেষ পাতা ~

মাড়াইয়ের জঙ্গল মাড়িয়ে – অভিজিৎ কুমার চ্যাটার্জি

অজানা খমকুট ড্যাম – সেখ মহঃ ওবাইদুল্লা

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - ৩য় পর্ব

আগের পর্ব - দ্বিতীয় পত্র

ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র - লাদাখ পর্ব

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ *লাদাখের আরও ছবি* ~

তৃতীয় পত্র

বন্ধুবর,

বেশ লাগছে জানো এই প্রায় অপার্থিব জগত। অন্তত আমার অনুভবে অপার্থিব। শরীরটা খারাপ। খুব ভোরে উঠতে পারছি না। সবার সঙ্গে ছাদে উঠে সকাল দেখা হচ্ছে না। না হোক। ওই তো আমার চোখের সামনে কাচের টানা জানলার ওপারে পাহাড়ের গায়ে লেহ্ প্যালেসের ভাঁজে ভাঁজে সকাল হচ্ছে যে, ওর মধ্যে বুঝি মায়া নেই?

১৬/১০/২০১৫
সকাল ৯টা, লেহ্

ঝকঝকে দিন। আজ রওনা প্যাংগং লেকের দিকে। প্রথমদিনের থিকসে মনাস্টারি যাওয়ার পথেই এগোনো। নুব্রা থেকে লেহ্ না ফিরে সরাসরিই চলে যাওয়া যেত প্যাংগং-এর অভিমুখে - আঘাম, শায়ক হয়ে - তাতে একটা দিন হাতেও থাকত। তেমনি প্যাংগং লেকের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে চুসুল হয়ে আরেক নির্জন গিরিপথ কাকসাং লা পেরিয়ে হানলে। সেখানে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম উঁচু অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরি - ১৪,৭৫০ ফিটে। হানলে গ্রামের খানদুয়েক হোমস্টের কোনওটায় থাকলে হাত বাড়ালেই যেন ছুঁয়ে দেওয়া যাবে তারায় তারায় ভরা রাতের আকাশকে। হানলে থেকে চলে যাওয়া যায় সো মোরিরি-র পথে। অর্থাৎ লেহ্ থেকে নুব্রা ঘুরে একেবারে প্যাংগং-সো মোরিরি দেখে নেওয়া যেতে পারে। বারবার লেহ্ ফিরে এসে আবার পরদিন রওনা না হলেও চলে। কিন্তু আমরা এসেছি লাদাখের ট্যুরিস্ট সিজনের একেবারে শেষে - অনেক জায়গাতেই হোটেল-হোমস্টে যেমন বন্ধ হয়ে আসছে, তেমনি পথে গাড়ির চলাচলও কমে এসেছে। নুব্রা থেকে শায়কের ওই পথের অবস্থা খুব ভাল নয়, যদি গাড়ি কোনওভাবে গণ্ডগোল করে, তাহলে সাহায্য পাওয়ার জন্য দু-একদিন সেখানেই অপেক্ষা করতে হতে পারে! তাছাড়াও অবশ্য প্যাংগং থেকে সোমোরিরির ওই পথে যাওয়া নির্ভর করবে চুসুলে পৌঁছানোর পর সেনাবাহিনীর অনুমতি যদি মেলে তবেই। তাই আমাদের এই বারবার লেহ্ ফিরে আসা - আর পরদিন আবার রওনা। লেহ্ থেকে কারু হয়ে এই পথে গাড়ির চলাচল তুলনামূলকভাবে বেশি।

রাস্তার দুপাশে হলদে-সবুজ গাছের সারি। দূরে বরফ মাথা পাহাড়। আরও এগিয়ে পথের পাশে নীল জলে শ্যে প্যালেসের ছায়া। আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ। দূরে স্টাকনা গুম্ফা। পথের পাশে নীল সিন্ধু বয়ে চলেছে। ছবি তুলতে আর ইতিউতি ঘুরতে নেমে গেছে সবাই। আমি জানলার ধারে খাতা-পেন নিয়ে একা বসে আছি। আলস্য! 'যাবার আগে এই কথাটা জানিয়ে যেন যাই/ যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই...' বাঁদিকে গায়ের কাছে ন্যাড়া পাহাড়। ডানদিকে পাহাড়ের সারি কিছুটা দূরে, তারও পেছনে বরফ মাথা পাহাড়েরা উঁকি দিচ্ছে। উপত্যকা জুড়ে সবুজ-হলুদ গাছ। সিন্ধুর নীল জল বয়ে চলেছে। আর এইসবই ঝলসাচ্ছে রোদ্দুরে।

তুমি বলতেই পার একই দৃশ্য। সত্যি লিখতে গিয়ে আমারও মনে হচ্ছে যেন পথের ক্যানভাসে একই ছবি আঁকছি বারংবার। অথচ বন্ধুবর, একবার এখানে এসে দেখো। প্রতিদিন প্রতিটা মুহূর্ত নতুন লাগবে। ফিরতে ইচ্ছা করবে না এই অপার্থিব ছেড়ে, সত্যি।

পরপর পেরোচ্ছি - পৌনে দশটায় কারু চেক পয়েন্ট, তারপর রেম্বেক মনাস্ট্রি, সাকতি।

রাস্তায় কদাচিত স্থানীয় মানুষজন চোখে পড়ছে।

উপত্যকার মাঝ বরাবর এঁকেবেঁকে চলা রুক্ষ রাস্তা আবার পাহাড়ে উঠছে। ঝাঁকুনিতে লেখাই যাচ্ছে না ছাই। তায় আবার ঠান্ডা বাড়ছে হু হু করে। 'সানশাইন অন মাই সোলডার মেকস মি হ্যাপি...'
অনেকটা উঠে গেছি পাহাড়ের গা বেয়ে - ঠান্ডা ক্রমশ বাড়ছে। আর কিলোমিটার পাঁচেক গেলেই চ্যাং লা পৌঁছাব।

বেলা ১১টা, চ্যাং লা

বরফে ঢাকা চ্যাং লায় খানিকক্ষণ থামা। ১৭,৫৮৬ ফিট। মিলিটারি ট্রাক ও অন্য দু-একটা গাড়িও দাঁড়িয়ে রয়েছে। গ্লাভস খুলে লিখতে গেলে হাত জমে যাচ্ছে। নেমে পড়ি গাড়ি থেকে। যে যার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বরফের মজা উপভোগ করছে। বরফের ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ের বাদামী শরীর কোথাও দেখা যাচ্ছে কোথাও বা একেবারেই না। ঝকঝকে নীল আকাশ। মাঝে মাঝে সাদা মেঘের টুকরো। পথের ধারে লেহ্ পর্যটন বিকাশ দপ্তরের পরিচালনায় কফিশপ, টুকিটাকি স্মারক-ও বিক্রি হয়। বেচারি চ্যাং লা - খারদুং লা (১৭,৫৮২ ফি.)-এর থেকে সামান্য উঁচু হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ যাত্রীই খারদুং লা-কেই বড়ভাই বলে জানে!

বুইয়ের একটা লোমওলা কুকুর বন্ধু জুটে গেছে দেখছি। এক জায়গায় কুকুরের বেশ একটা ছোটখাটো দল জড়ো হয়েছে। এটা একটু দলছাড়া হয়ে ঘুরছে।
আমরা রওনা দেওয়ার সময় প্যাংগং-এর দিক থেকে এসে দাঁড়াল একজন বাইকার। মোটরবাইকের পিছনে বাঁধা তার জিনিসপত্র। অ্যাডভেঞ্চারের কথা কল্পনাই করে গেলাম সেই ছোটবেলায় চাঁদের পাহাড়ের দিনগুলো থেকে - অর্ধেক জীবন পেরিয়ে এলাম - এইরকম বরফঢাকা আলগা নুড়িছড়ানো পাহাড়ি পথে - প্রায় ১৮০০০ ফিট উঁচুতে একাকী মোটরবাইক চালিয়ে অদেখার উদ্দেশে যাওয়া হল কই?
আবার এগিয়ে চলা। পথের দৃশ্য অনেকটা একই। কোথাও বাদামী পাহাড় কোথাও সাদা-বাদামীতে, কোথাও একেবারে সাদা। বরফের ভেতর দিয়ে মাথা তুলে রয়েছে বড় বড় পাথর আর ওদেরই গায়ে গায়ে জন্ম নিয়েছে শ্যাওলার মতো আগাছার দল।
চ্যাংথাং পেরিয়ে গেলাম।

১১-৪৫, সোলতাক লেক

১৬,১৯০ ফিট উচ্চতায় সোলতাক লেকের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। মাথার ওপরে একটা ঈগল ডানা মেলে উড়ে গেল।
মিলিটারি বেস এই সোলতাক। যদিও কোথাও জন-মনিষ্যি দেখা যাচ্ছেনা। টলটলে নীল জলের সরোবর শান্তভাবে শুয়ে আছে নির্জনে, ফিকে হলুদ-খয়েরি পাহাড়দের মাঝে।

১২-৩৫, তাংস্তে গ্রাম

একটু আগেই দুরবুক গ্রাম পেরিয়ে এসেছি। অ্যাডভেঞ্চারের ইচ্ছে থাকলে নুব্রা থেকে সরাসরিই চলে আসা যেত এই দুরবুকেই আগেই তো বলছিলাম তোমাকে। গা ছমছমে নির্জন সেই বোল্ডারপ্রতুল রাস্তায় যাওয়া হল না এযাত্রায় - সাহসে না কুলানোয়। অনেকটাই নীচে নেমে এসেছি এখন। সাড়ে তের হাজার ফিটে। বরফ নেই আর। ছড়ানো পাথর আর লালচে শ্যাওলায় বিস্তীর্ণ তাংস্তে ভ্যালি। শ্যাওলার নিচে জল রয়েছে। ইয়াক চোখে পড়ল বেশ কয়েকটা। এছাড়া পোষা ভেড়া আর বিস্তর লোমওলা কুকুর। ভ্যালি পেরিয়ে তাংস্তে গ্রাম। মিলিটারি চেকপোস্ট। পথের ধারের দোকান থেকে খিদের মুখে গরম গরম ম্যাগি খাওয়া হল।
প্যাংগং লেকের ধারে ঠান্ডায় রাত কাটাতে না চাইলে খানিক কম উচ্চতার এই তাংস্তেতে থাকেন কেউ-কেউ। অবশ্য যাঁরা প্যাকেজ ট্যুরে বেড়াতে আসেন, তাদের সাধারণত লেহ্ থেকে ভোর-ভোর রওনা করিয়ে প্যাংগং লেকের ধারে খানিকক্ষণ কাটিয়ে আবার বেলাবেলি লেহ্ ফিরিয়ে নিয়ে যান এজেন্সির লোকজনেরা।
একদিকে ন্যাড়া পাহাড়। অন্যদিকে পাহাড়ের গায়ে অল্প অল্প আগাছা চোখে পড়ছে। পথে একটা ছোট লেক পড়ল। জল-শ্যাওলার বদলে বালি আর বালি। বালি দেখে সৌম্য আবার উট খুঁজছিল।
একটা ব্রিজ পেরোলাম। মানে বাঁ দিকের পাহাড়ের গা থেকে সরে গিয়ে এবারে ডান দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে চলা।
তারপর আবার চলা হলুদ পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে - কখনো খানিক নামা, আবার ওঠা। হঠাৎ গাড়ি থামাল তুন্ডুপ - আমাদের ড্রাইভার। বাঁদিকে দুই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে অনেকটা দূরে নিচে উঁকি দিচ্ছে ঘন নীল জলের হাতছানি - প্যাংগং সো।

বেলা ৩-০০, প্যাংগং সো

পথের বাঁ দিকে খানিক নিচে নীল জলের লেকের পাড় ঘিরে বাদামী আর কালচে পাহাড়ের মাথায় ছবির মতো সাদা মেঘেরা আটকে রয়েছে যেন। ডানহাতে লুকুং গ্রাম এখন প্রায় ফাঁকা। অফ সিজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রিসর্টের কাঠের বাড়ি। টেন্টগুলোর আচ্ছাদন খুলে নেওয়া হয়েছে - সারি সারি সিমেন্টের খালি চাতালে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াশবেসিন আর ইওরোপিয়ান কমোডগুলো দেখলে বোঝা যায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার প্যাংগং সো এখন বেশ জনপ্রিয় ট্যুরিস্টদের কাছে। গ্রামের গা ঘেঁষে রঙিন রঙিন বৌদ্ধ পতাকারা মাথা তুলে আছে, পেছনে রাস্তার ওপারে ঝুঁকে আছে তুষারাবৃত শিখরের সারি।
ঢাল বেয়ে গাড়ি নেমে আসে জলের কাছে। কোথাও তার রঙ নীল। কোথাও বা খানিক ঘন হয়ে সবুজ হয়ে এসেছে। জলের আয়নায় মুখ দেখছে পাহাড় আর মেঘেরা। বালির রঙ সাদা আর হালকা হলুদে মেলানো মেশানো। লেকের বাঁপাশে সরু বালিপথে হাঁটলে দুপাশেই নীল জল - মনে পড়ে যাবেই 'থ্রি ইডিয়টস্' সিনেমার শেষদিকটা - যেখানে বেশ কয়েক বছর পর আবার দেখা হয় তিন বন্ধুর। জলে আর পাড়ে অজস্র সীগাল।

তাদের কারোর রঙ পুরোই সাদা, কেউ বা সাদাতে-কালোতে। হঠাৎ হঠাৎ এক ঝাঁক উড়াল দিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে এক একটা চিত্রকল্প।

প্যাংগং লেকের আকারে লম্বাটে ধরণের - প্রায় ১৩৪ কিমি দৈর্ঘ্যের ষাট শতাংশই চিনের সীমানার মধ্যে। আমরা আছি এখন লেকের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে, পুবদিকে লেকের ধার দিয়ে স্প্যাংমিক, মান, মেরাক গ্রাম পেরিয়ে রাস্তা বেঁকে গেছে চুসুলের দিকে - আর খানিক দূর এগোলে প্যাংগং-এর মাঝ বরাবর চিন-ভারত নিয়ন্ত্রণ রেখা - এই নীল জল, এই পাখিগুলো জানে কি সে কথা?

সিজন ফুরিয়ে এলেও এখনো কিছু কিছু ট্যুরিস্ট এসেছে আমাদের মতই প্যাংগং-এর আকর্ষণে। যে যার মতো ঘুরে বেড়ায় অলস পায়ে। আমিও পায়ে পায়ে জলের ধারে দাঁড়াই এসে। জল ছুঁয়ে নিই দুহাতে।

মুগ্ধ হই সেই নির্জন নীলে।

দীপের ডাকে খেয়াল ফেরে। মেয়ের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হঠাৎ করে। আমরা দুজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অক্সিজেন দিতে খানিক বাদে কিছুটা ঠিক হয়। লাদাখ ভ্রমণের এইদিন থেকে অক্সিজেনের সিলিন্ডারটা মোটামুটি আমাদের তিনজনের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। দীপ আর বুইয়ের বেশ কয়েকবার শ্বাসকষ্ট হয়েছে। আমারও পরে একদিন। বাকী সঙ্গীদের অবশ্য কোনও শারীরিক অসুবিধে হয়নি।

বুইয়ের শরীর একটু ঠিক হলে আবার তিনজনে জলের কাছে এসে দাঁড়াই। মনটা একটু খারাপই হয়ে গেছে তিনজনেরই। হাই অল্টিচ্যুডের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ তো রোজই খাওয়া হচ্ছে।

লেকের ধারে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে আবার মনটা খানিক হালকা হয়ে যায়। সন্ধে নেমে আসছে নীল জলের বুকে।

এখানে থাকব কী থাকব না ভাবতে ভাবতে থাকাই ঠিক হল শেষপর্যন্ত। লেকের ধার থেকে উঠে এসে গ্রামের দিকে গাড়ি এগোল স্প্যাংমিক গ্রামের দিকে।

পাথরের নীচু নীচু দেওয়ালের মাঝে মাঝে হলদেটে ঘাসজমি, ফাঁক দিয়ে পাথরবিছানো পথ। ইতিউতি ঘরবাড়ি - কিন্তু লোকজন দেখা যাচ্ছে সামান্যই। সেনাবাহিনীর চৌকি আছে। এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাতের আস্তানা খুঁজতে বেরোয় সঙ্গীরা। বিকেল ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। হোম স্টে - সাসোমা - ছাই রঙের বাড়ির দেওয়ালে আর জানলা বরাবর সাদা দাগ টানা।

বাড়ির সামনে তাঁত বুনছেন এক লাদাখি বৃদ্ধা - মুখে বয়সের আঁকিবুকি। সৌম্য নাম দিল চরকা বুড়ি। ইনিই সাসোমা - হোমস্টে চালানোয় সাহায্য করেন ওঁর মাঝবয়সী হাসিখুশি মেয়ে।

পাহাড়ের গায়ে নীল সরোবর ছুঁয়ে শান্ত গ্রামে সন্ধ্যা নেমে আসছে ক্রমশ। জানলার ধারে বসে লিখছি। সব মিলিয়ে বাড়িতে গোটা পাঁচেক ঘর - তার তিনটে আপাতত আমাদের দখলে। আর কোনও যাত্রীর আসার সম্ভাবনা নেই এই সময়ে। এলেও অবশ্য সাসোমা ও তাঁর মেয়ের থাকার অসুবিধে হবেনা - কারণ ওরা রাতে ঘুমান রান্না-কাম-খাওয়ার ঘরে। একটা বড় ঘরে বীরেন আর চন্দনদারা। মানে টুসি-চুমকি দুই বোনের পরিবার। সামনের একটা ছোট ঘরে সৌম্য - তার পরের ঘরে আমরা তিনজন ও অক্সিজেন সিলিন্ডার। আমাদের ঘরটায় দুটো খাট আছে। একটা ডাবল আর অন্যটা সিঙ্গল। আর থান ইটের মতো ভারী কম্বল। বাড়ির শেষপ্রান্তে রান্নাঘর - পাশে কমন বাথরুম।

রাত্তির যতো বাড়ছে, ঠান্ডাও। বাইরে তারায় ভরা আকাশ। সামনে রুপোলি চাদর বিছানো প্যাংগং। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না তীব্র ঠান্ডায়। গ্রামের সোলার ইলেক্ট্রিসিটি সিস্টেম খারাপ। তাই ঘরের অন্ধকারে ভরসা মোমবাতি।

বীরেনদের ঘরে মোমের মৃদু আলোয় খানিকক্ষণ মেমরি গেম খেলা হল সবাই মিলে - তারপর ঠান্ডা বাড়তেই রান্নাঘরে গিয়ে জুটেছি। ঘরটার ঠিক মাঝখানে একটা ছাদ ফুঁড়ে ওঠা লম্বা সিলিন্ডারের মধ্যে গনগনে আগুন জ্বলছে। আগুনের ওপরে জল গরম হচ্ছে। ওখান থেকে জল নিয়েই আমাদের হাত-মুখ ধোওয়া আর বাথরুমের কাজ সারা হয়েছে। বাড়ির বাসিন্দারা সকলেই রান্নাঘরে। এই ঘরটাই কেবল যা গরম। মেঝে বিছানো মোটা কম্বলের ওপর গোল হয়ে বসে সামনের ছোট টুলে থালা বাটি নিয়ে রাতের খাওয়া - গরম গরম ডাল-ভাত-আলুসেদ্ধ অমৃতসমান। তাক হাতড়ে আচার, মাখনের অবশেষ বের করে আনেন সাসোমার মেয়ে - ভাষার ব্যবধানে বেশি গল্প হয়না - তবে সারাক্ষণই মুখে হাসি দুজনেরই। বহুক্ষণ ধরে খাওয়া আর আড্ডা চলে আমাদের। আমার তো খেয়ে আর উঠতেই ইচ্ছে করে না। রান্নাঘরটা এত গরম হয়ে গেছে যে সোয়েটারও খুলে ফেলি। এদিকে হাত ধুতে বেরোলেই তো ঝপাস করে ঠান্ডার কবলে। বাইরের তাপমাত্রা বোধহয় শূন্যের আশেপাশে।

রাত্তিরে বুইয়ের খুব কষ্ট হয়, দীপেরও। বেশ খানিকক্ষণ পালা করে অক্সিজেন নেয় দুজনেই। দীপ তো প্রায় সারারাত জেগেই ছিল - ভোরবেলা সৌম্য-র ঘরে গিয়ে যখন ওকে ডাকে আড্ডা দেওয়ার জন্য সৌম্য ভারী রাগ করে কেন ওকে রাতেই ডাকা হয়নি বলে।

১৭/১০/২০১৫, স্প্যাংমিক গ্রাম, প্যাংগং সো

পথের ধারের দোকানে ব্রেকফাস্ট - গরমাগরম ব্রেড-অমলেট বা ম্যাগি। ফেরার পথে তাড়া আছে। আজ থেকে লাদাখ হিল কাউন্সিলের ভোটপর্ব শুরু। এতকাল কংগ্রেসের রাজ থাকলেও এবার বুদ্ধ-র দেশে বিজেপি-র রমরমা বেশি। এত কষ্টে দিন কাটানোর পরেও এরা ভোট দিতে সকলেই বেশ আগ্রহী। আসলে বঞ্চিত মানুষের কিছুই তো অধিকার থাকে না। অন্ততঃ ভোট দেওয়ার অধিকারটুকু তাই বোধহয় এদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ।

পৌনে নটা নাগাদ প্যাংগংকে বিদায় জানিয়ে রওনা দিলাম ফেরার পথে। পেছনে পড়ে রইল স্প্যাংমিক গ্রাম। নীল জলের লেক যখন শেষবারের মতো পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল, মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। সকালে তার আর এক অপরূপ চেহারা। তবু বড় কম সময় থাকা হল। যেন দেখা হল না কিছুই দু চোখ ভরে।

সকাল ১০-৪৫, দুরবুক

পথের ধারের দোকানে ব্রেকফাস্ট - গরমাগরম ব্রেড-অমলেট বা ম্যাগি। ফেরার পথে তাড়া আছে। আজ থেকে লাদাখ হিল কাউন্সিলের ভোটপর্ব শুরু। এতকাল কংগ্রেসের রাজ থাকলেও এবার বুদ্ধ-র দেশে বিজেপি-র রমরমা বেশি। এত কষ্টে দিন কাটানোর পরেও এরা ভোট দিতে সকলেই বেশ আগ্রহী। আসলে বঞ্চিত মানুষের কিছুই তো অধিকার থাকে না। অন্ততঃ ভোট দেওয়ার অধিকারটুকু তাই বোধহয় এদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ।

দুপুর ১২-০০, চ্যাং লা

এবারে থামা অল্পক্ষণের জন্যই। উল্লেখযোগ্য, একটা হিমালয়ান মোনাল চোখে পড়ল। কিন্তু ক্যামেরাবন্দি করা যায়নি।

লেহ্-তে ফিরে এসে দুপুরের খাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ফিরে দেখি ভোটের কল্যাণে দোকানপাট সব বন্ধ। প্রবল খিদের মুখে আমাদের উদ্ধার করল সেই সদাহাস্যময় ধনগিরি বোম ঠোকরি। আমাদের হোটেলে এমনিতে গেস্টদের জন্য শুধু ব্রেকফাস্ট আর যতবার ইচ্ছে চা-কফির ব্যবস্থা - লাঞ্চ-ডিনারের আয়োজন নেই। যখন ফিরেছি ততক্ষণে তার এবং হোটেলের মালকিনের পরিবারেরও দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে। রিসেপশন রুমের টেবিলেই মালকিনের ঘর থেকে থালায় থালায় ভাত আর ডাল নিয়ে আসে ধনগিরি। খিদের মুখে তাই দারুণ লাগে। আমরা হাত-মুখ ধুয়ে সকলের শেষে বসি। ডালও তখন তলানিতে। আচার হবে, বা মাখন? ধনগিরি প্রথমে না বলেও আবার খুঁজেপেতে কয়েক দলা মাখন এনে দেয়। ব্যস, চমৎকার পেট ভরে যায়।

তৃপ্তি করে খেয়ে উঠে রিসেপশনের লাউঞ্জে বসি। দীপ বলেছে লাউঞ্জের আলমারি থেকে গতকাল বীরেন 'সেভেন ইয়ারস ইন টিবেট' বইটা পেয়েছে। আমিও উঁকিঝুঁকি মারি আলমারিটায়। ধনগিরিকে বলতেই তালা খুলে দেয় আর বলে যেটা ইচ্ছে নিয়ে যান। হিন্দি, ইংরেজি ছাড়াও নানা বিদেশি ভাষায় লেখা এই বইগুলো বিভিন্ন সময়ে বেড়াতে এসে লোকজন ফেলে গেছে। যত্ন করে তাদের আলমারিতে তুলে রাখে ধনগিরি, আর কেউ পড়তে চাইলেই তাকে দিয়ে দেয়। আমরাও উলটে পালটে দেখে একটা বই সংগ্রহ করি।

ঘরে গিয়ে বিশ্রাম আর আড্ডা। কদিন ধরেই ভাবছি, লেহ্-তে একটা বাঙালির তেলেভাজা আর চায়ের দোকান খোলা বড় জরুরি। এই ঠান্ডায় বিকেল-সন্ধে হলেই প্রাণটা কেমন কেমন করে ওঠে যে।

(ক্রমশ)

আগের পর্ব - দ্বিতীয় পত্র

~ *লাদাখের আরও ছবি* ~

'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্ত নেশায় লেখক, ভ্রামণিক, ভ্রমণসাহিত্য গবেষক। প্রকাশিত বই - 'অবলা বসুর 'ভ্রমণকথা', 'আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত - ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমহিলাদের ভ্রমণকথা - ১ম পর্ব' (সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

আবার সমুদ্রে

তপন পাল

মাসে অন্ততঃ একবার সমুদ্র না দেখলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তা কাছেপিঠে আর সমুদ্র কোথায়! বকখালি যাওয়ার বড় হ্যাপা, আর চাঁদিপুর গেলে ফেরার সময় ১২৮২২ ধৌলি এক্সপ্রেস বড়ই দেরি করে। রাত সাড়ে সাতটার পরিবর্তে সাড়ে নটায় সাঁতরাগাছি নেমে মনে হয় এ কোথায় নামলাম!
অগত্যা ঘরের কাছেই আরশিনগর - দিঘা। ওয়ারেন হেস্টিংস কথিত ব্রাইটন অফ দি ইষ্ট। অবশ্য আমাদের প্রজন্মের কাছে দিঘার এক স্বতন্ত্র আবেদন আছে। দিঘা পর্যটন কেন্দ্রকে জনপ্রিয় করায় 'বিকেলে ভোরের ফুল' নামে একটি বাংলা চলচ্চিত্রের অবদান রয়েছে। ১৯৭৪-এ চলচ্চিত্রটি যখন মুক্তি পায় আমি একাদশ শ্রেণীতে পড়ি। স্কুল কেটে ওই ছবি দেখার ও তৎপরে এক সপ্তাহ 'দিঘা দিঘা দিঘা', 'নীল সমুদ্র ডাকছে' ইত্যকার গানে বুঁদ হয়ে থাকার স্মৃতি এখনও অমলিন। তারপর রেলগাড়ি হয়ে গিয়ে দিঘা তো এখন দিনান্তভ্রমণ গন্তব্য।
তবে কিনা এ বছরে গরমটা বড় বেশি পড়েছিল। তাই পুত্র কন্যার বিরোধিতায় মাস দুয়েক যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বার বার সে কথা বলতে তারা কোথা থেকে এক ওয়ালপেপার এনে পড়ার ঘরের দেওয়ালে লটকে দিল।
ছবিটি বড় ভালো – কালচে সবুজ জল অনুচ্চ তরঙ্গায়িত - কিন্তু বড়ই শান্ত। আমাদের বঙ্গোপসাগরীয় চঞ্চলতায় ওই প্যাসিফিক প্রশান্তি বড়ই বেমানান।
তাই গ্রীষ্ম শেষ হতেই মন চলো বৃন্দাবনে। এবারের পরিকল্পনাটি কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমী। সকালে ১২৮৫৭ তাম্রলিপ্ত ধরে সাড়ে নটায় কাঁথি। সেখান থেকে ঘুরেফিরে সন্ধ্যে ছটা কুড়িতে দিঘা থেকে ১৮০০২ কান্ডারী ধরে সাঁতরাগাছি।

উদ্দেশ্য –
১) তমলুক দিঘার মধ্যে রেললাইনের স্মৃতিমেদুর শব্দ শোনা! ভারতে এখন সবখানেই রেলপথ ঝালাই করা। তমলুক দিঘা শাখায় তা অদ্যাবধি ফিশপ্লেট দিয়ে জোড়া। তাই রেলগাড়ি চলার শৈশব সংলগ্ন ঘটাং ঘটাং ঘট আওয়াজ একমাত্র ওই শাখাতেই শোনা যায়।
২) যাত্রাপথের দুধারে বর্ষার ঘন সবুজ ভূচিত্র দেখা।
৩) কাঁথির নাচিন্দা মন্দির ও মারিশদার জগন্নাথ মন্দির দেখা।
৪) 'আমাদের ছুটি'-র ফোরামেই বাঁকিপুটের কিছু ছবি দেখে জায়গাটিকে স্বচক্ষে দেখার বড় ইচ্ছা হল। সঙ্গে জুনপুট, দরিয়াপুর লাইট হাউস, রসুলপুর ও কপালকুন্ডলা মন্দির দেখা।
৫) মন্দারমনি ও শংকরপুর।

রেল যাত্রা –
বাড়ি থেকে সকাল সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে সোয়া ছটায় হাওড়া উনিশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে গাড়ি ছাড়বে। ফাঁকা কামরাগুলি ঢুকতে খুঁজে পেতে সি ১ কোচে উঠে ঊনচল্লিশ নম্বর সিটে বসে পড়া গেল। সিটটি জানলার ধারে। গাড়ি ছাড়ল।
শীতে এই গাড়ি থেকে সূর্যোদয় দেখা এক অভিজ্ঞতা। কিন্তু এখন দিন বড়। সূর্য অনেক আগেই উঠে পড়েছে। ক্রমে সাঁত্রাগাছি, বাউড়িয়া, উলুবেড়িয়া - থামা না থামা অনেক ইষ্টিশান পেরিয়ে মেচেদা।
বারবার যাতায়াতের সূত্রে এই পথ চেনা। এই তো সেদিন এক সাহেব আর তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে কোলাঘাট ঘুরতে এসেছিলাম। সেই সাহেবের মা ২৭ আগষ্ট, ১৯৪৭ রাত ১১টা ৪৪-এ কোলাঘাট স্টেশনে এক রেল দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। ১৪আপ হাওড়া নাগপুর প্যাসেঞ্জার কোলাঘাট স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ৮আপ হাওড়া টাটা প্যাসেঞ্জারের পিছনে ধাক্কা মেরেছিল। সাহেব তখন চার বছরের। এই ঘটনার পর পরই সাহেবের পিতা ভারত ছাড়েন। এতদিন বাদে দুই ছেলেকে নিয়ে Historical Family Tour-এ কোলাঘাট দর্শন।
মেচেদা পেরিয়ে পাঁশকুড়ার একটু আগে বাঁদিকে ঘুরে গাড়ি দিঘা অভিমুখে। আদিগন্ত সবুজ পেরিয়ে কাঁথি বেলা সাড়ে নটায়।

তারপর –
দরদস্তুর করে একটা গাড়ি ঠিক হল। সওয়ারি আমি একাই। প্রথম গন্তব্য নাচিন্দা। জাতীয় সড়কের ধারে এই মন্দিরটিকে দিঘা যাতায়াতের পথে দেখেছি অনেকবার। অপ্রথানুগ বিগ্রহের মন্দিরটি আদতে দেবী শীতলার। কিন্তু নতুন গাড়ি কেনার পর জনগণ এই মন্দিরে পূজা দেন। গাড়ির সঙ্গে জগন্নাথদেবের সম্পর্ক আমরা জানি - কিন্তু গাড়ির সঙ্গে ছোঁয়াচে রোগের দেবীর এই সমীকরণ সত্যিই আশ্চর্যের।
উজিয়ে, অর্থাৎ কলকাতার দিকে দশ কিলোমিটার মত গিয়ে মন্দির। মন্দিরচত্তুরে তখন ভোগের যোগাড় চলছে - সবজি কোটা, মাছ কোটা - কিন্তু সময় নেই। ভোগ খেতে না পাওয়ার দুঃখ হু হু করে বুকের মধ্যে। কবে কোন কোন খানে গিয়ে ভোগ না খেয়ে চলে আসতে হয়েছে - বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দির, রাজবলহাটের রাজবল্লভীর মন্দির, জয়রামবাটির মাতৃমন্দির - সেই দুঃখ বুকের ভেতর থেকে এক পুকুর বিষাদ তুলে আনে যেন।
তারপর জাতীয় সড়ক ধরে কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে সরু রাস্তা ধরে নাচিন্দার বাহিরি জগন্নাথ মন্দির। পরিত্যক্ত ওড়িশি ধাঁচের বিশাল মন্দিরটি চারশো বছরের প্রাচীন। পুরীর রাজা তাঁর প্রজারা কেমন আছে দেখতে একবার এক রাজকর্মচারীকে দূত করে এখানে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এসে বন্যারোধ থেকে কৃষি - জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কিছু ব্যবস্থা নেন। তারপর তিনি যখন ফিরতে চান, স্থানীয় জনগণ তাঁকে যেতে দেয়নি। আক্ষেপে তিনি বলেন - না গেলে আমার প্রভুর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটবে। তখন স্থানীয়রা প্রস্তাব দেন তাহলে আপনার প্রভুকে এখানে আনুন। আপনার ও আমাদের সবাইয়ের জন্য গড়ে ওঠে ওই জগন্নাথ মন্দির।

পরবর্তীতে বিগ্রহ স্থানান্তরিত হয়েছে নতুন মন্দিরে, কিঞ্চিৎ দূরত্বে সেও দাঁড়িয়ে পূর্ণ মহিমায়। জগন্নাথ দেবের নবকলেবরের প্রস্তুতি চলেছে।

ঘুরে ফের কাঁথি - তারপর সরলরৈখিক কাঁথি জুনপুট রাস্তা ধরে জুনপুট। জুনপুটের বিখ্যাত মাটির সৈকত (Clay Beach) দেখার ইচ্ছাটা অনেক দিনের। কিন্তু আজকের জুনপুট যেন এক নেক্রোপলিস - মৎস্য বন্দর থেকে পর্যটন কেন্দ্র – সম্ভাবনা ছিল অসীম; কিন্তু কেন যেন কিছুই হয়ে উঠল না। তাই এক হাঁটু কাদা ভেঙে বৃষ্টিতে ভিজে কাঁকড়া ধরা আর মাছ শোকানোই এর ভবিতব্য।
কাঁকড়া খেতে ভালোই লাগে। কিন্তু কাঁকড়া ধরা যে কী পরিশ্রমসাধ্য ও বিপজ্জনক কাজ, তা আগে জানা ছিল না। কাদা প্যাচপেচে মাঠের ওপরে দুই ব্যক্তিকে নীচু হয়ে কিছু করতে দেখে জিজ্ঞাসা করি, 'কি করছো গো?' 'আজ্ঞে কাঁকড়া ধরছি।' 'তাই নাকি!' চকিতে গামছা পরে আমিও ওঁদের সঙ্গে যোগ দিই। আকাশের নীচে, জল, হাওয়া, সবুজ আর মাটির সান্নিধ্যে চলে আমাদের অভিযান। তাঁদের হাতে লোহার লম্বা শিক। তার মাথাটি বাঁকা। গর্ত দেখে তাঁরা বুঝতে পারেন কোন গর্তে কাঁকড়া আছে, তারপর শিকটি ঢুকিয়ে বাঁকা মাথায় কাঁকড়ার দাঁড়াটি আটকে তাকে তুলে আনা।

কিন্তু যেখানে গর্ত গভীর, শিক কাঁকড়া অবধি পৌঁছয় না। তখন কাদায় উবু হয়ে বসে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে, হাত ঢুকিয়ে কাঁকড়াকে তুলে আনতে হয়। 'ভয় করে না - গর্তে তো কাঁকড়া ছাড়া অন্য কিছুও থাকতে পারে?' 'সে আর ভাবতে গেলে চলে?' সত্যিই তো - জীবন বড়ই জটিল। সারা সকাল ঘুরে ওঁরা মাত্র দুটি কাঁকড়া পেয়েছেন। আর রয়েছে মাছ শোকানো। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে বাঁশের মাচার ওপরে, বড় বড় সিমেন্টের চৌবাচ্চায় ও ড্রামে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে কত মাছের মৃতদেহ!

লাল কাঁকড়া দেখতে বাঁকিপুট যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কাদায় রাস্তা দুর্গম - সেটি এ যাত্রায় আর হয়ে উঠল না। দরিয়াপুর লাইট হাউসে ভ্রমণার্থীদের ঢুকতে দেওয়া হয় বেলা তিনটের পর, তাই সেটি বাইরে থেকেই দেখতে হল।

সারথি মহোদয় তারপর নিয়ে গেলেন পেটুয়াঘাট দেশপ্রাণ মৎস্য বন্দরে। দশ টাকা টিকিট কেটে ঢুকতে হল। রসুলপুর নদীর তীরে নতুন গড়ে ওঠা বন্দরটিতে ব্যস্ততা তুঙ্গে - কী প্রখর তার বৈপরীত্য জুনপুটের অলস কর্মহীনতার সঙ্গে। প্রায় শ'দুয়েক ট্রলার ঘাটে রয়েছে বাঁধা - কোনটায় বরফ উঠছে, কোনটায় ডিজেল। কোনটা থেকে মাছ নামছে তো অন্যটায় সারেং কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে সহযোদ্ধাদের মধ্যাহ্নভোজনে ডাকছেন। প্রতিটি ট্রলারের মাথায় তিনটি করে জাতীয় পতাকা- সামুদ্রিক ঝোড়ো হাওয়ায় তারা পত পত করে উড়ছে নীল আকাশের পটভূমিকায়।
ঘুরে ফিরে রসুলপুর গ্রাম - ফেরিঘাট। সেখানেও জলে ট্রলার ভাসছে। নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ - জবাব পেলাম ইটাবেড়িয়া। জানি না সত্যি কিনা।
সারথীটি কিঞ্চিৎ বাচাল, কিন্তু কিই বা আর করা যাবে। সেই মহাভারতের যুগ থেকেই সারথীরা বাচাল। তবে বাঁচোয়া যে তিনি গাড়ি চালাতে চালাতেই কথা বলেন। গাড়ি থামিয়ে নয়। তাঁর কথা শুনতে শুনতে এই অঞ্চলের আর্থসামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

রসুলপুর থেকে বেরিয়ে কপালকুন্ডলা মন্দির। ছোটখাটো গৃহস্থবাড়ি সংযুক্ত মন্দির। তারপর কাঁথি ফিরে বিলম্বিত মধ্যাহ্নভোজন।

তাজপুর - সরু রাস্তা ধরে এঁকেবেঁকে অনেকখানি; দুধারে প্রচুর হোটেল। তারপর বিস্তৃত সৈকত। বাঁয়ে নদী এসে সাগরে মিশেছে। নদীর পরপারেই মন্দারমনি।
সৈকতটি সমতল - বহুলবিস্তৃত। একটি বড় ঢেউ এলে জল পা ভেজাতে চলে আসে। অনেক অনেক দূর অবধি সুউচ্চ বাতিস্তম্ভে সৈকত রাতেও আলোকিত, তবে হোটেলগুলি সৈকত থেকে বেশ কিছুটা দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে। হোটেলগুলিতে যাঁরা থাকেন তাঁরা সূর্যাস্তের পর কী করেন, জানতে কৌতূহল ছিল। সৈকতে বেশ ভিড়। দেখে মনে হল অধিকাংশই দিঘা থেকে দিনান্তভ্রমণের পথিক।

এবার শংকরপুর। দশ টাকার টিকিট কেটে সরকারি অফিসের এলাকার মধ্য দিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখি সমুদ্র গ্রাস করেছে সৈকত; জেগে আছে শালখুঁটির বাঁধ। সমুদ্র তখন উত্তাল। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি, কালো মেঘ সাগরের আয়নায় ঝুঁকে মুখ দেখছে। যতদূর চোখ যায় - আমি আর চা ও আনুষঙ্গিক বিক্রেতারা।

হাতে অনেক সময়। দিঘা থেকে রেলগাড়ি ছাড়বে ছটা কুড়িতে। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকি, একা একা।
শেষে উঠতেই হয়। নিউ দিঘা। কাজু কিনে ষ্টেশনে।
ফেরা – তখনও ১৮০০১ কান্ডারী ঢোকেনি। ষ্টেশনে থিক থিক ভিড়। মহিলা, বাচ্চা... দলবল জানতে চায় অসংরক্ষিত কামরাটি কোথায় পড়বে।
অবশেষে ট্রেন ঢোকে। বাতানুকূল কামরা ঝাড়াই পোঁছাই এর জন্য খালি করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেখি কামরার দেওয়ালে তদবধি ১২৮৫৭ তাম্রলিপ্তর আরক্ষণ তালিকা। তাতে আমার নাম জ্বলজ্বল করছে। প্ল্যাটফর্মে ঘুরে দেখি অসংরক্ষিত কামরায় থিকথিকে ভিড়। বহু মানুষ দাঁড়িয়ে।
রেলগাড়ি ছাড়ে। এক ঘুমে মেচেদা পার। সাঁতরাগাছি রাত ৯টা পঁচিশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে। 'আমাদের ছুটি'-র জন্যই তাঁর কলম ধরা।

অজানা দ্বীপ মৌশুনী

অনিরুদ্ধ ভৌমিক

অনেকদিন ধরেই বেরিয়ে পড়ার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সকলের আবদার এবারও একটা 'আউট অফ ট্র্যাক' জায়গা ঠিক করতে হবে, যা দু'রাতের মধ্যে ঘুরে আসা যায়। তাই রীতিমতো পড়াশুনা করার দায়িত্ব পড়ল আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ওপরেই। এক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কিছু ভ্রমণ পত্রিকা, গুগল ও আমাদের মতো আরও কিছু ভ্রমণপিপাসু বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে একটা জায়গার নাম উঠে এল - 'মৌশুনী আইল্যান্ড।' প্রথমে নিজেরই ধন্দ লাগছিল, নামটা 'মৌশুনী' নাকি 'মৌসুমী'। দেখলাম, কলকাতা থেকে মাত্র ১৬০ কিমি দূরত্বে নামখানা ব্লকের অন্তর্গত এক অখ্যাত দ্বীপের নাম এই 'মৌশুনী আইল্যান্ড'। যার কথা ২০১৪ সালের 'The Hindu' সংবাদপত্রে "Bengal's Sinking Island" নামে একটা প্রচ্ছদকাহিনিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৬ ডিসেম্বর, আমরা দুজনে ও আরও তিনবন্ধু মিলে ধর্মতলায় হাজির হলাম। প্রাইভেট বাসে চেপে নামখানার উদ্দেশ্যে যখন যাত্রা শুরু হল ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে সাতটা। রবিবারের কলকাতা তখন সবে আড়মোড়া ভাঙছে। আমতলা, ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ পেরিয়ে নামখানা পৌঁছালাম, বেলা সাড়ে এগারটা। বাসস্টপ থেকে টোটোতে চেপে নদীঘাট। হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী পেরিয়ে, আবার মোটর ভ্যানে চেপে যাত্রা শুরু দশ মাইলের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে অপর একটি ভ্যানে করে পাড়ি দিলাম আর একটি নদীঘাটের দিকে, নাম যার 'পাতিবুনিয়ার ঘাট'। ভারী অদ্ভুত সব নাম। পাতিবুনিয়া যাওয়ার পথে একটু একটু করে বদলাতে লাগল দৃশ্যপট।

সরু ইটের একপাশে সরকারি সংরক্ষিত এলাকা বা খাল বলাই ভালো, যেখানে সারি সারি ট্রলার দাঁড়িয়ে আছে। আর অন্য পাশে জেলে ও মাঝিদের গোবরমাটি দিয়ে নিকানো পরিষ্কার পরিছন্ন ছোট ছোট ঘর। প্রতিটি বাড়িতেই গরু-মুরগির সমাগম। অনেক জায়গায় চোখে পড়ল মাছ ধরার জাল শুকোচ্ছে, কোথাওবা ট্রলার মেরামতির কাজ চলছে, কোথাও মহিলারা জাল বুনছে। এই সমস্ত সরল-সাধারণ মানুষগুলোর জীবনযাপনের ছবি মনে করিয়ে দিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প "পদ্মা নদীর মাঝি"-র কথা। ঘাটের ঠিক কাছ থেকে নাকে ভেসে আসছিল 'শুঁটকি' মাছের গন্ধ। যারা এ রসে রসিক, তাদের কাছে গন্ধটি সুখকর হলেও আমার কাছে মোটেও তা ছিল না। নদীবাঁধে উঠে দেখতে পেলাম চপলা চঞ্চলা নারীর মতো বয়ে চলেছে চেনাই নদী। বর্ষার মরশুমের মতো শীতেও তার ভরা জল। আর দূরে দেখা যাচ্ছে আমাদের গন্তব্য - মৌশুনী আইল্যান্ড।

পাতিবুনিয়ার ঘাট

কমন কিংফিশার

এখানেও অপেক্ষা করছিল আরেক চমক। ঘাট তো রয়েছে কিন্তু কোন যাত্রী বা নৌকা নেই। আমাদের এই অবস্থা দেখে একজন স্থানীয় লোক এগিয়ে এসে বললেন, 'দাদা, সকালের শেষ ফেরী তো দুপুর সাড়ে বারোটায় চলে গেছে, পৌনে তিনটের সময় আবার ফেরী সার্ভিস শুরু।' শুনে তো মাথায় তো বজ্রাঘাত। হঠাৎ দেখি, এক পাটাতনের ও ছাউনিবিহীন একটা বোট এসে ঘাটে থামল। তাতে এক মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার জন্য আনা হয়েছে। রোগী নামার পর মাঝি ভাইকে আমাদের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাজি করানো হল দ্বীপে পৌঁছে দেবার জন্য। এরকম এক বোটে করে নদীতে ভেসে পড়ার যে অনাবিল ভয়মিশ্রিত আনন্দ, তা লিখে বোঝানো দায়। নদী পারাপার হওয়ার শুরুতেই এক শঙ্খচিলের উড়ে যাওয়া চোখে পড়ল। চারদিকে রূপোর চাদরের মতো চিকচিক করছে চেনাই নদীর জল। ভেসে রয়েছে জেলেদের ছোট ছোট ডিঙি নৌকা। নদীর বুক চিরে মাঝে মধ্যে ছুটে চলেছে

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলার।

মৌশুনী আইল্যান্ড থাকার জায়গা

বেলা পৌনে দুটো নাগাদ অবশেষে পৌঁছালাম বহু প্রতীক্ষিত মৌশুনী দ্বীপে। ঘাট থেকে নদীবাঁধে উঠে যতদূর চোখ যায়, চারদিকে শুধু সবুজের সমাগম। মাঝে মধ্যে একটা দুটো মেঠো বাড়ি। আমাদের জন্য আগে থেকে অপেক্ষা করছিল উত্তম, সেই কাঁচা রাস্তা ও ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে চিনিয়ে নিয়ে এল থাকার জায়গায়। থাকার ব্যবস্থাটাও এই পরিবেশের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য পূর্ণ। সাদা রঙ করে আলপনা দেওয়া ইটের দেওয়ালের ওপর খড়ের ছাউনির পরপর দুটি ঘর। সামনে খানিকটা ফাঁকা ঘাসের জমির ওপর যত্ন করে লাগানো কিছু ফুলগাছ। অন্যদিকে সুপারি গাছের পাশে বাঁশের মাচা, বসার জায়গা।

আর বাঁশের বেড়ার লাগোয়া একটা বড় ও আরেকটা মাঝারি গোছের পুকুর। ঘরের ভিতর কোন তথাকথিত হোটেলের প্রাচুর্যতা না থাকলেও রুচিসম্মত ভাবে সাজানো। রঙবেরঙের কাজ করা হাতপাখা, র‍্যাকের ওপর বেশ কিছু ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ও ইংরেজি পেপারব্যাক সাজানো, সাদা কলাই-এর থালার ওপর হাতে আঁকা সুন্দর কিছু সুভ্যেনির, আর সারা দেওয়াল জুড়ে আলপনা। এককথায় এই ছোট্ট ঘরেও যেন এক মনোরম গ্রাম্যতা। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে একেবারে গিয়ে বসলাম ভাতের পাতে। সঙ্গে আলুভাজা, ডাল, লাউ চিংড়ির তরকারি, মাছ ও চাটনি, এককথায় অনবদ্য।

বালিয়াড়া সমুদ্র সৈকত

রসনাতৃপ্তির শেষে এবার দ্বীপ ঘুরে দেখার পালা। আমাদের বিকেলের গন্তব্য তিন কিমি উত্তরের বালিয়াড়া সৈকত। শুরুর দিকে রাস্তা ভাঙা হলেও পরের পুরো রাস্তাটাই ঢালাই করা। অতএব যাওয়ার খুব বিশেষ অসুবিধা হলো না। রাস্তার দু-ধারে ধানক্ষেত, কোথাও আলু বা লঙ্কার ক্ষেত, কোথাওবা মাচা থেকে ঝুলছে কুমড়ো। মাটিতে ছড়ানো গাছে টমেটো। দেখতে দেখতে রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছালাম। সেখান থেকে ভ্যান চালক দাদার নির্দেশানুযায়ী ডান দিকে ঝাউবনের মধ্য দিয়ে খানিক হেঁটে বালিয়াড়ি।

যতদূর চোখ যায় বিস্তৃত সমুদ্র সৈকত। শীতের অস্তগামী সূর্যের গোধুলির স্নিগ্ধ আলোর সঙ্গে বিশালাকার সৈকতের নীরবতা মিশে এক অদ্ভুত রহস্যময়তার সৃষ্টি করেছে। সেই নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তির বুক চিরে ভেসে আসছিল সিগাল ও টার্নারদের বিষন্ন স্বগতোক্তি। সন্ধ্যা ঘনাল সৈকতে। একটা আবছা অন্ধকারের জালের ঘেরাটোপে প্রকৃতি যেন তার সকল চিত্রপটের ওপর যবনিকা টেনে দিচ্ছে। এই প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ছেড়ে এবার আমাদের ঘরে ফেরার পালা। ঘরে ফিরে চা, চিঁড়েভাজা, দিয়ে একপ্রস্থ জমাটি আড্ডা শুরু হল। রাত নটায় উত্তম আমাদের জন্য খাবার নিয়ে উপস্থিত - গরম রুটি, দেশি মুরগির মাংস ও মিষ্টি।

বালিয়াড়া সমুদ্র সৈকত

ভোরবেলা পাখির কোলাহলে ঘুম ভাঙল। আজকের গন্তব্য কাঁকড়ামারির চর - পাখি দেখার এক আদর্শ জায়গা। সকাল সাতটার মধ্যে চরে পৌঁছালাম, তখনও কুয়াশা ভালো করে কাটেনি। ভ্যানচালক বললেন, "কাল চারদিক পরিষ্কার ছিল।" প্রকৃতির খেয়ালের সঙ্গে পেরে ওঠা দুষ্কর। মাঝে মাঝেই নিবিড় নিস্তব্ধতা ভেঙে পাখিদের ডানার শব্দ আর সুমিষ্ট ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। চালকের ইশারায় দেখি একজোড়া কমন কিংফিশার এক দৃষ্টিতে জলের দিকে চেয়ে বসে আছে। আমাদের উপস্থিতি তাদের ধ্যানে কোন বিঘ্ন ঘটায়নি জেনে আশ্বস্ত হলাম। সতর্ক দৃষ্টিতে আমরা কখনও জলের দিকে, কখনও ঝোপঝাড়ের দিকে ও গাছের ডালের ওপর চোখ রেখে এগিয়ে চললাম। এগোতে এগোতে বুঝতে পারছি গাছগুলো ক্রমশ ঘন হয়ে একে অপরের হাত ধরে সমস্ত জায়গাটাকে বেড়া দিয়ে রেখেছে। মাথার ওপর একটা গাছে তখনো কতগুলো টিয়া ঘুম থেকে ওঠেনি। তাদের আর বিরক্ত করার ইচ্ছা হল না। খুব কাছ থেকে পাখির ডানাঝাপটানো আওয়াজ শুনে দেখি একটা হোয়াইট বিলড সি ঈগল মরা গাছের ডালে বসে। কানে আসছিল ফিঙের শিস্। ইতি-উতি চাইতে ফিঙে দম্পতিদের দেখে এবার আমরা অন্যরাস্তা ধরলাম। ভাটা চলতে থাকায় কতগুলো স্যান্ডপাইপারও চোখে পড়ল। আরও খানিক এগোনোর পর পাখিদের তীব্র কলতান কানে আসল। অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখি, একটা কাঁটা ঝোপের ওপর পাঁচটা বার্ন সোয়ালো বসে তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে। পাখি দেখা সাঙ্গ হল।

হোয়াইট বিলড সি ঈগল

আজ মৌশুনী দ্বীপ ছেড়ে বেরোনোর পালা। ঘরে ফিরে চটপট টিফিন খেয়ে, জিনিসপত্তর নিয়ে নদীপথের রাস্তা ধরলাম - পরের গন্তব্য 'হেনরি আইল্যান্ড'-এর উদ্দেশ্যে।

বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত অনিরুদ্ধের ছোটবেলা থেকেই নানান ভ্রমণ পত্রিকা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জিম করবেট পড়ে, বিভিন্ন লেখায় বর্ণিত জায়গাগুলিকে দেখার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল। মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন কলেজে উঠে। ২০০৫ থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচে তথা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ও কর্মসূত্রে বিদেশের এমন অনেক জায়গা দেখেছেন, যার নাম হয়তো কম মানুষই শুনেছেন। জীবনে খুব সহজ তিনটি বিষয়ে বিশ্বাস করেন - যা দেখব, যা শিখব এবং যা খাব - তাই-ই সঙ্গে যাবে, বাকি সব এই পৃথিবীতেই পড়ে থাকবে। তাই সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্রের অমোঘ টানে নিরন্তর ছুটে চলেছেন।

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

বিনসারের জঙ্গলে

সুদীপ্ত ঘোষ

~ বিনসারের আরও ছবি ~

মার্চের শুরু। পরিযায়ীরা যে যার মতো ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। বাতাসে শীতের আমেজ মিলিয়ে গিয়ে হাল্কা আগুনে মেজাজ। রাজস্থানের ধূসর রুক্ষ প্রান্তর জুড়ে শুধু বাবুল, হিঙ্গট আর ফণীমনসার ইতস্তত কাঁটাঝোপ। ফিল্ড ওয়ার্কের মাঝে প্রায় শুকনো জলাশয়ের পাড়ের কাদায় চিতার (লেপার্ড) পায়ের ছাপ মস্তিস্কের গ্রে সেলকে আর উত্তেজিত করে না। হাল দেখে সোহিনী বলল, 'তুমি ক্লান্ত। একটু স্বাদ বদল দরকার।' শুনে তো এককথায় রাজি। চল মন বৃন্দাবন। আই.আর.সি.টি.সি.-তে লগইন আর টিকিট বুকিং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হয়ে গেল। সোহিনী হেসে বলল, 'সংসারের বাকি কাজে এতো প্রোঅ্যাকটিভ হলে আমাদের উন্নতি অবধারিত।' ঈষৎ হেসে ব্যঙ্গোক্তিটার পাশ কাটালাম। শাস্ত্রের তাই বিধান। তবে ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন বলতেই হবে। মাসখানেকের মধ্যেই জয়পুর থেকে কাঠগোদামের আসা-যাওয়ার দুটো টিকিট পাওয়া গেল। যেটা আজকের বাজারে দুষ্প্রাপ্য। জায়গা ঠিক না হলেও টিকিট কেটে নিলাম, কেন না কাঠগোদাম থেকে যাওয়ার অজস্র জায়গা। প্রকৃতির কোলে কোনও নিরিবিলি, নির্জন গ্রাম হলেই সবচেয়ে ভালো। দিনকয়েকের হোমওয়ার্ক আর ইন্টারনেট সার্ফিং-এর পর মনমত জায়গা ঠিক হল, বিনসার - আলমোড়া ডিস্ট্রিক্টে। পাহাড়, জঙ্গল, হিমালয় আর কী চাই? সঙ্গে উপরি পাওনা গৌনাপ গ্রাম। হোমস্টে। বিনসারের ঠিক নীচে। পাকদণ্ডী বেয়ে ৫-৬ কিলোমিটার। হিমালয়ের কোলে ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামে বসে জ্যোৎস্নায় ভেজা উপত্যকা নাকি এক অপার্থিব সৌন্দর্য। আগে কর্মসূত্রে ওই অঞ্চলে একাধিকবার গেলেও বিনসার যাওয়া হয়নি। দেরি না করে দিন তিনেকের জন্য কে.এম.ভি.এন.-এর ওয়েবসাইট থেকে বিনসারে গেস্টহাউস বুক করে নিলাম। মাঝের একদিন গৌনাপে হোমস্টে।

কাজ শেষ করে জয়পুর পৌঁছেই ফিল্ডের জিনিস নামিয়ে আবার লোটা কম্বল বেঁধে নিলাম। দুদিন পর জয়পুর থেকে রানিখেত এক্সপ্রেস। দুপুর দুটো পঁয়ত্রিশে ছাড়ে। রাত দশটা নাগাদ দিল্লি পৌঁছে ডিনার। ডিনার করেই যে যার বার্থে কম্বলের নীচে সেঁধোলাম। সোহিনী রিডিং লাইট জ্বেলে খুলে বসেছে "জিম করবেট অমনিবাস।" নেক্সট ট্রিপে আবার করবেট ভাবতে ভাবতে তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল প্ল্যাটফর্মের হৈ হট্টগোলে। ষ্টেশন হলদোয়ানি। কামরার দরজা খুলতেই শীতের আমেজ। ধোঁয়া ওঠা চায়ের ভাঁড়ে শুরু হল দিন। ট্রেন কিছু লেট। ভালোই হল, একদম কাকডাকা ভোরে পৌঁছাতে হবে না। সোহিনী তখনও গভীর ঘুমে। কাঠগোদাম পৌঁছানোর কিছু আগে সোহিনীর ঘুম ভাঙল। ফ্রেশ হয়ে অপেক্ষা কাঠগোদামের। লাগেজ বিশেষ কিছু নেই, দুজনের দুটো রুকস্যাক।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। সার দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে। বিনসার শুনে কাউকেই খুব একটা উৎসুক লাগলনা। নৈনিতাল, ভীমতাল হাঁকডাকই বেশি। ভিড় পাতলা হতেই যদিও বিনসার-এর জন্য ঝুলোঝুলি। গাড়ি দরদাম করে ঠিক করতেই, আরও দুজন এসে উপস্থিত। লিফট চাই। ভীমতাল অব্দি। শেয়ারে যেতে চায় পার্টনার পাচ্ছেনা। দেখে নিজেদের কলেজ লাইফ মনে পড়ে গেলো। ব্যাকপ্যাকার্স ট্রিপ। যদি হও সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন। জীবনে কোথায় কার সাথে দেখা হবে তার তো কোনও ছকে বাঁধা নিয়ম নেই।

কাঠগোদাম থেকে বিনসারের দূরত্ব ১০৪ কিলোমিটারের আশেপাশে। গাড়িতে সাড়ে তিন ঘণ্টার মতো। কাঠগোদাম থেকে ভিমতাল, ভওয়ালি, আলমোড়া হয়ে বিনসার। রাস্তায় যখন নামলাম, সূর্যদেব দর্শন দিয়েছেন। শালবনের পাতার ফাঁক গলে আসা মুঠো মুঠো রোদ্দুর কালো পিচ ঢাকা রাস্তায় ইতস্তত ছড়ানো। শহুরে ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় ছুটে চলেছে গাড়ি। তবে পাহাড়ি হলেও রাস্তা যথেষ্ট চওড়া ও আরামদায়ক। জানলার কাচ নামাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল দস্যি হিমেল হাওয়া। বাতাসে এখনও শীতের ছোঁয়া। কামড়টাই যা নেই। সদ্য ঘুমভাঙা পাহাড় তখনও আড়মোড়া ভাঙছে। রাস্তার পাশের জঙ্গলে শালের আধিক্য। ধীরে ধীরে শালের জঙ্গল পাতলা হয়ে শুরু হয়ে গেল পাইন, ওকের দাদাগিরি। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় নরম মিঠে রোদ্দুর সঙ্গে করে পৌঁছালাম ভীমতাল। ক্ষণিকের বিরতি। চা এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ। পথের বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে আবার পথচলা। চলার পথে চেনা দোকান, কফি শপ দেখে পুরনো স্মৃতির আনাগোনা, অজান্তেই পুরনো কথা, পুরনো বন্ধুদের জন্য মন কেমন। পাহাড়ের অচেনা বাঁকে নাম না জানা অর্কিডের ভিড়, পাইন বনের ফাঁক দিয়ে একঝলক তুষারশুভ্র গিরিশিখর। বাতাসে শীতের কামড়টা আরেকটু বেশি।

ভওয়ালি, আলমোড়া পেরোনোর পর প্রকৃতি আরও দিলখোলা। সবুজ ঘাসের গালিচামোড়া, কেয়ারি বাগান। বাঁশের বেড়া দেওয়া কাঠের বাড়ি। এসব দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম বিনসার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির দোরগোড়ায়। ফরেস্টচৌকিতে নিয়মমাফিক কাজকর্ম মিটিয়ে ঢুকে পড়লাম স্যাংচুয়ারির মধ্যে। নিবিড়, ঘন, আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধা দেখানো পাইন, ফার, ওকের জঙ্গল। লাল ফুলে ছাওয়া রডোডেনড্রনের সারি। ফুলে ঢাকা রাস্তা, পাহাড়ি বাঁকে ছায়ার মমত্ব, শহুরে, ছাপোষা, মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিল। আমরা সবাই রাজা। না হলে হিমালয়ের কোলে এই নিরালা প্রান্তরে এত আয়োজন কিসের! কার জন্য এই রেড কার্পেট ?

গেস্ট হাউসে চেকইন করে লাঞ্চ সেরে নিলাম। বাইনোকুলার, সালিম আলির বই আর ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জঙ্গলের রাস্তায়। পড়ন্ত দুপুরের রোদে তখনও ছেলেমানুষি আশকারা, মেঠো পাহাড়ি পথে ঝরে পড়া রডোডেনড্রনের কার্পেট বাঁচিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। নীচে উপত্যকায় মেঘেদের ভেসে চলা। উপত্যকা পেরিয়ে হিমালয়ের আঁকিবুঁকি। সুউচ্চ পাইন, ওকের প্রকাণ্ড গুঁড়ি, কাণ্ডে শ্যাওলার পুরু আস্তরণ। সূর্যের আলো অনেক সময়ই মাটি অব্দি পৌঁছাচ্ছে না। গাছের ডালে শাখামৃগদের দাপাদাপি। বয়স্ক ও বিচক্ষণ দলপতির গম্ভীর মুখে আর সাবধানী চোখে আগন্তুকদের পর্যবেক্ষণ। গাছে গাছে ছোট বড় নানা প্রজাতির পাখির কলতান। উঁচুনিচু পথ বেয়ে পৌঁছে গেলাম জিরো পয়েন্টের

কে এম ভি এন গেস্টহাউস, বিনসার

কাছে। ওয়াচ টাওয়ার থেকে কুমায়ুন হিমালয়ের মুখোমুখি। পাশেই বন্য জীবদের জন্য জল খাওয়ার পরিখা। ওয়াচ টাওয়ারের থামেই বাসা বেঁধে আছে গ্রেট টীটের দল। মানুষজনের দিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নেই। টীটের ঘর গেরস্থালী দেখার ফাঁকেই শরীরে বড়সড় ছায়া ফেলে উড়ে গেল হিমালয়ান ঈগল। নীল ঝকঝকে আকাশে প্রসারিত তার সফেদ ডানা - 'আলোর আকাশে ঈগল।'

ওয়াচ টাওয়ারের সামনের একফালি জমিতে তখন প্রজাপতির ওড়াউড়ি। নানা রঙের মেলা। জগত জুড়ে আনন্দমেলা। জীবনের ভালো মুহূর্তগুলো কেন জানি তাড়াতাড়ি কেটে যায়। সম্বিৎ ফিরল গুঞ্জনে। জঙ্গলের রাস্তা থেকে ভেসে আসছে। সেলফি স্টিক হাতে শহুরে টুরিস্ট দলের আবির্ভাব হতেই আবার বনের পথে ফিরলাম।

পাকদন্ডিতে রডোডেনড্রনের কার্পেট, বিনসার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি

জঙ্গলের রাস্তায় কিছুটা ফিরে বাঁ দিকের টিলাটায় উঠতে শুরু করলাম। ও হরি, এ যে "শিয়ার জোন।" ভুতত্ত্ববিদ দম্পতি হওয়ার কিছু সুবিধা তো আছেই, চিন্তা ভাবনার ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ করে। চোখ টিপে বললাম, "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" তখন বিকেল ঢলতে শুরু করেছে। ফেরার পথ ধরলাম। পাখিদের কলতানি এবার ঘরমুখো। গেস্ট হাউসে ফিরে চায়ের কাপ হাতে ছাদে। সূর্যাস্তে আকাশের রঙ বদল।

সন্ধ্যে নামল। শহুরে ক্যাকোফোনি ভুলিয়ে ঝিঁঝিঁ-র একটানা ঐকতান। গেস্ট হাউসের চারদিকের জঙ্গলে জমাট বাঁধা অন্ধকার। চাঁদের আলো হিমালয় আলো করে রাখলেও জঙ্গলের গভীরে তার প্রবেশ নিষেধ। এখানে বিদ্যুৎ নেই। রাতে ডিনারের সময় এক ঘণ্টার জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা। সামনের নিকষ কালো অন্ধকারে মিটিমিটি জোনাকি। অদূরে নিশাচর পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। হুইসলিং পাইনের ফিসফিসানি, শুকনো পাতায় খসখস শব্দে কোনও প্রাণীর হেঁটে যাওয়া, পাতা ঝরার শব্দে, বিকেলের রোম্যান্টিসিজম সন্ধ্যের মুখে গা ছমছমে। কাঠের ইন্টিরিয়রে সাজানো গেস্ট হাউস, উডেন ওয়াল, ক্যান্ডেল স্ট্যান্ড, মোমবাতির আলোছায়া সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য অনুভূতি। কাঁচের জানলার পাশে চেয়ার টেনে বসলাম। মোমবাতির আলোয় খুলে বসলাম স্টিফেন কিং-এর উপন্যাস, আর সোহিনীর হাতে জিম করবেট অমনিবাস।

মেঘ সমুদ্দুর

পরদিন ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। জানলার বাইরে তখন উদ্দাম ঝড়ের দাপট, সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃষ্টি। গৌনাপ যাত্রা বিশ বাঁও জলে। পাহাড়ি উপত্যকায় বসে জ্যোৎস্না দর্শন তখন অকূল পাথারে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির দাপট বেড়ে চলল। ডাইনিং রুম অব্দি পৌঁছানোই এক বিড়ম্বনা। এসেছিলাম জ্যোৎস্নার রূপ দেখতে, কিন্তু প্রকৃতি দেবীর ভাবনায় অন্য কিছু ছিল। সমস্ত পাহাড়, উপত্যকা জুড়ে মেঘের জলছবি। জঙ্গলে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশার মতো ঝুলে আছে মেঘ। জানলা খুললেই ভিজে মেঘের স্নান। মেঘ পিওনের ব্যাগে মনখারাপের দিস্তা ছিল কিনা জানা নেই, আমার কিন্তু বেশ লাগছিল জানলায় বসে পাহাড় আর বৃষ্টির ভালবাসা দেখতে। অবলীলায় কেমন মেঘের বুক থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে গভীর উপত্যকায়। গহীন অরণ্যানী সদ্যস্নাতা তরুণীর মত লজ্জাবনত।

দুপুরে লাঞ্চের পর গেস্ট হাউসের ডাইনিং রুমের নীচের কাচঘেরা ঘরে বসলাম।

এখান থেকে চারিদিকে অনেকটা জঙ্গল দেখা যায়। গাছের ডালে কিছু হনুমান বৃষ্টিতে উপুস ঝুপুস ভিজে বসে আছে। ছোটটা মায়ের কোল ঘেঁষে। হঠাৎই উল্টোদিকের জঙ্গল থেকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে এলো একটা হলুদ আর বাদামী ছোপের 'হিমালয়ান পাইন মার্টেন।' প্রচণ্ড ব্যস্ত জীবন তার। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নানা কসরত দেখাল। কখনও চলে এল খুব কাছে, কখনও গা ঢাকা দিল ঝোপের আড়ালে। গাছের ডালে বসা হনুমানের দলও তার খুনসুটি দেখতে ব্যস্ত। বেশ মজাই লাগছিল, যেন আমরা খাঁচায় আর বাকিরা স্বাধীন। সত্যিই তো 'বন্যেরা বনে সুন্দর।' গতকালের আলাপ হওয়া ড্যানিশ দম্পতিও পায়ে পায়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। মার্টেনের দুষ্টুমি যখন চরমে তখনই আচমকা গাড়ির হর্ন। বেচারা সেই যে গা ঢাকা দিল আর দর্শন দিলই না। বিকেলে বৃষ্টিটা ধরে এল। কিন্তু ঠাণ্ডা এক ধাক্কায় তিন চার ডিগ্রি কমিয়ে দিল। আকাশের মুখ তখনও ভার।

রাতের আকাশে তারা ফুটল না।

প্রথম আলো - গেস্টহাউসের ছাদ থেকে ভোরের কুমায়ুন হিমালয়

কাকভোরে দরজায় নক। পাশের রুমের বিদেশিনী বোর্ডার। "গুড মর্নিং। ইট্‌স প্লেজান্ট আউটসাইড।" ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। ঘড়িতে চারটে পঁচিশ। লাফ দিয়ে জানলার কাছে গিয়ে পরদা সরালাম। মেঘ কেটে গিয়ে ভোরের আবছা আলোয় দূরের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে গেস্টহাউসের ছাদে, ওটাই ভিউ পয়েন্ট, দিগন্ত জোড়া হিমালয়। প্রায় তিনশো ডিগ্রির ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ভিউ। অত সকালেও অনেকেই হাজির। গেস্টহাউসের সামনের গভীর উপত্যকা তখন মেঘসমুদ্দুর। শান্ত সমাহিত। সমুদ্দুরে মাঝে মাঝে দ্বীপের মতো মাথা উঁচু করে আছে ছোটবড় পাহাড়। কখনও ঢেউ উঠছে সেই সাদা মেঘে। কখনওবা দুই সুউচ্চ শৈলশিরার মাঝ বরাবর মেঘের জলপ্রপাত। আকাশ একটু একটু করে ফরসা হচ্ছে। একে একে চেনা যাচ্ছে তুষারঢাকা গিরিশিখর। নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, মৃগথুনি, মাইকতোলি, নন্দাদেবী, ছাঙ্গুছ, নন্দকোট আর সমগ্র পঞ্চচুল্লী। মনে হচ্ছে গোটা কুমায়ুন রেঞ্জটাই ছোঁয়া যাবে হাত বাড়িয়ে। পঞ্চচুল্লীর ওপর আকাশে তখন রঙ লেগেছে। আকাশে গোলাপি জলরঙের তুলির টান। দিনের প্রথম আলো ত্রিশূল শৃঙ্গে। পঞ্চচুল্লীর চূড়া টপকে এবার উঁকি দিল সূর্য। জীবনের অনেক সূর্যোদয়ের মধ্যে অন্যতম স্মরণীয়।

রডোডেনড্রনের ফাঁক দিয়ে হিমালয় দর্শন

ব্রেকফাস্ট করে আবার জঙ্গল ভ্রমণ। আজ আর শিক্ষানবিশি নয়। গুরু পাকড়ালাম। গাইড। অভিজ্ঞ চোখে চিনিয়ে দিলেন হরেকরকম পাখি। কথায় কথায় জানলাম প্রায় দুশো বা তারও কিছু বেশি প্রজাতির পাখির সাম্রাজ্য এই বিনসার। তাছাড়া হিমালয়ান চিতল, কালো হরিণ, গড়াল, রেড জায়ান্ট ফ্লাইং স্কুইর‍্যাল, লেপার্ডও খুব দুর্লভ নয়। সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে টো টো। জঙ্গলের পাকদণ্ডী বেয়ে আবার হিমালয় দর্শন। মাঝে মধ্যে ঘাসের বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়া। পাইনের কোণ কুড়ানো। পাখির আলাপচারিতায় আড়ি পাতা। এরই মাঝে ঝুপ করে নেমে এলো সন্ধ্যে। পাইন বনের মাথায় চাঁদ উঠলো। ঝকঝকে আকাশে নক্ষত্রমালা। ডিনার করে নিস্প্রদীপ ঘরের জানলায় দুজনে। বাইরে জ্যোৎস্নামাখা পাহাড়। কান পেতে শুনছি সেই 'অন্ধকারের গান।'

পরদিন দুপুরে ফিরে চলা। মুঠিভরা জ্যোৎস্না, ঝরা পাতার গান আর ঝরেপড়া রডোডেনড্রনের ঘ্রাণ বুকে নিয়ে ফিরে চললাম চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে। ফেলে যাওয়া দীর্ঘশ্বাসে হয়তো আবার ফিরে আসার আশ্বাস। ঠিক জানি না।

~ *বিনসারের আরও ছবি* ~

পেশায় জিওলজিস্ট সুদীপ্ত ঘোষ বর্তমানে ভারত সরকারের 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার' জয়পুর অফিসে কর্মরত। কাজের সুবাদে বছরে ছয়মাস পাহাড়ে-জঙ্গলে। ফিল্ডে অবসর কাটে বই পড়ে - বিশেষত ক্রাইম থ্রিলার আর ভ্রমণকাহিনি। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পাখি দেখাও নতুন সংযোজন পছন্দের তালিকায়। ভালো লাগে বেড়াতে - পাহাড় আর জঙ্গল দুইই প্রিয়। এছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া অন্যতম পছন্দের কাজ। লেখালেখির অল্পবিস্তর চর্চা থাকলেও, কোনও পত্র-পত্রিকায় পাঠানোর দুঃসাহস আগে হয়নি।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

মায়াবী মেনমেচো

সুপর্ণা রায় চৌধুরী

~ সিকিম সিল্করুটের আরও ছবি ~

ছোটবেলা থেকেই রাত আমার ভীষণ প্রিয়। অনুভূতির গভীরে রাতের আকুল ডাক যেন এক মায়া, বা গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া সবটাই আমার কাছে অপূর্ব। আর সেই রাত যদি হয় কোনও এক পাহাড়ের কোলে, তবে তার সেই রূপের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা খুবই কঠিন কাজ। এমনই এক মায়াবী রাত আর তার পরের এক আশ্চর্য ভোরের কথা আজ লিখতে বসেছি যা আমার কাছে আমৃত্যু মনে রেখে দেওয়ার এক অভিজ্ঞতা।

জুলুক বেড়াতে গিয়ে কর্তা আর আমি উঠেছিলাম ওরই এক বন্ধুর বাড়িতে। দাদা-ই ডাকি তাকে। রেশমপথে তাদের পাঁচপুরুষের ব্যবসা। সেই সৌভাগ্যে সেখানে জমি এবং বাড়ি। বাড়িতেই ছোট্ট হোমস্টে। জুলুক যখন পৌঁছলাম রাতের ঝকঝকে আকাশ তারায় ভরা। দারুণ ঠান্ডা হাওয়ায় হাতটা জমে আসছে। মিলিটারি ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে পাহাড়গুলোকে দেখে মনে মনে পরের দিনের ভোরের অপেক্ষায় ঘরে ঢুকলাম। চন্দুভাই ততক্ষণে খাবার, বিছানা তৈরি করে এসে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল - "ওয়েলকাম।" বললাম, এসেছি কিন্তু সেই লেক মেনমেচোতে মায়াবী রাত দেখব বলে। হেসে বলল সকালে তৈরি থাকতে। দাদা যে কথা বোনকে দেয়, তা সব সময় রাখার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, সে আমার বড় দাদাই বটে। কারণ মেনমেচো যাওয়া বড়ই কঠিন একটা কাজ।

থাম্বি ভিউপয়েন্ট থেকে জিগজ্যাগ রোড ও জুলুক

সকাল শুরু হল ভজন শুনে। আর্মি ক্যাম্পের মন্দিরে ভজন চালিয়ে দেয় মাইকে, সারা জুলুকের মানুষের সেই ভজন শুনে ঘুম ভাঙে। কী যে সুন্দর লাগে সে সকাল! পাহাড়ের গা দিয়ে সূর্য তখনও পুরোপুরি ওঠেনি। শীতভেজা সকাল অপূর্ব। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে রওনা দিলাম পুরনো রেশমপথ ধরে জুলুক থেকে আরও ওপরে ওঠার জন্য। চন্দুভাই-এর বাড়ির পিছন দিক থেকে দেখা যায় সাপের মতন পাহাড়কে পেঁচিয়ে রাস্তা ওপরে উঠে যাচ্ছে। সেই রাস্তা ধরেই গাড়ি যাচ্ছে। চন্দুভাই দেখিয়ে বলল, আমরা যাব ওই ওপরে। থাম্বি ভিউপয়েন্ট - যেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর নিচের জিগজ্যাগ রোড পুরো পরিষ্কার দেখা যায়। জুলুক থেকে ওপরের দিকে তাকালে যেমন সুন্দর, আবার ওপর থেকে জুলুককে দেখতেও ততটাই সুন্দর। ভিউপয়েন্টে যখন পৌঁছলাম রোদ ঝলমলে আকাশ - চোখের সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জ একদম পরিষ্কার - বরফের চাদর মুড়ে শুয়ে আছে। শিখরগুলো খুব ভাল করে চিনিয়ে চলেছে চন্দুভাই। আর আমি ছবি তুলতে তুলতে মনের আনন্দে বিভোর হয়ে উঠছি।

চন্দুভাই ডাক দিল গাড়িতে ওঠার জন্য। বলল, এবার যাব মেনমেচো। শুনেছি, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেখানে পৌঁছাতে হয়। আর্মির পারমিশন পাওয়া খুব ঝামেলার। অবশ্য আমি আছি মজাতে - ওসব নিয়ে আমার কোনও টেনশন নেই - সব দায়িত্ব চন্দুভাই-এর। গাড়ি চালু হতেই চন্দুভাই বলল, সামনে আসছে নাথাং ভ্যালি। অপূর্ব সুন্দর এই ভ্যালিটাকেই দেখে কেমন যেন আনমনা মনে হল। সুন্দর রঙবেরঙের কাঠের বাড়ি, খেলার মাঠ, স্কুল, মন্দির, প্রাচীন গুম্ফা সবই আছে, কিন্তু কোথাও কোনও মানুষজন দেখতে পেলামনা, কেন জানি না। হতে পারে এখানে অক্সিজেন এত কম, তাই হয়ত লোকজন রাস্তায় কম চলাফেরা করে।

নাথাং ভ্যালি

কুপুপ লেক

চন্দুভাইকে বললাম ফেরার সময় একরাত নাথাং ভ্যালিতে থেকে তারপর যাব। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল বাবা মন্দিরের উদ্দেশ্যে। আর্মিদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে নাথাং ভ্যালিকে পিছনে ফেলে গাড়ি এগিয়ে চলল কুপুপ লেকের দিকে। কুপুপ লেকের কাছে যেতে দেয় না, পুরোটাই আর্মিদের দখলে। রাস্তার ওপর থেকে লেক দেখে মনে হয় অনেকটা হাতির মতন - তাই এলিফ্যান্ট লেকও বলে। দূর থেকেই দেখা আর প্রচুর ছবি তোলা হল।

নাথাং ভ্যালি দেখে যাওয়া হল বাবা মন্দিরে। এই অঞ্চলে আসল ভগবান বলতে ওরা এই হরভজন সিং বাবাজিকেই মানে। সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, সবাই বাবাজিকে বিশ্বাস করেন এবং অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে তার পুজোও করে প্রতিদিন। ১৯৪৬ সালে পাঞ্জাবের একটা ছোট্ট গ্রামে হরভজন সিং-এর জন্ম। ১৯৬৬ সালে আর্মিতে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে সিকিম তথা উত্তরবঙ্গ বন্যার কবলে পড়ে। সেইসময় আর্মির উদ্ধারকাজে হরভজন সিং তাঁর পারদর্শিতা দেখান। সেই বন্যারই এক রাতে এক বাঙ্কার থেকে আর এক বাঙ্কারে যাওয়ার সময় প্রবল বৃষ্টি আর ঝড়ে একটি পাহাড়ি নদীতে তিনি পড়ে গিয়ে ভেসে যান। কোনওভাবেই বাঁচানো যায় নি। সেইসময় তাঁর দেহও উদ্ধার করা যায় নি। শোনা যায় যে, কিছুদিন পরে তাঁরই সঙ্গে একই বাঙ্কারে থাকা এক বন্ধু স্বপ্নে দেখেন হরভজন সিং বলে দিচ্ছেন তাঁর দেহ কোথায় আছে। সেই অনুযায়ী সেনাবাহিনী থেকে গিয়ে দেহ উদ্ধার করা হয় এবং আদি বাবা মন্দিরে সমাধিস্থ করা হয়। তারপর থেকেই এই রাস্তায় বাবাজি অতন্দ্র প্রহরী। কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকলে বা বিপদ আসন্ন এমন সময় দেখা দিয়ে বলে যান। যারা ওই রাস্তায় গাড়ি, ট্রাক, বাইক ইত্যাদি চালান তাঁরা ভগবান রূপে পূজা করেন। এমন কী চায়না বর্ডারের সেনারাও নাকি বলেছেন তাঁরা এক ছায়ামানুষকে দেখতে পান প্রহরীর বেশে বর্ডাররক্ষা করতে। গল্পটা শুনে গাটা আমারও শিউরে উঠেছিল। আসলে মানুষই তো ভগবান। আমরা শুধু শুধুই মন্দির, মসজিদ, গির্জায় ছুটি। স্বার্থ, হিংসা ত্যাগ করে যদি মানুষকে ভালবাসা যায়, তবে ঈশ্বর তোমার সঙ্গেই বিরাজমান। এখন নতুন বাবা মন্দিরও হয়েছে হরভজন সিং-এর। নতুন বাবা মন্দিরের ঠিক পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি পাহাড়ের গা বেয়ে আবার নীচে নেমে গেছে সেটাই মেনমেচো। মেনমেচো যখন পৌঁছলাম তখন মধ্যাহ্ন। সূর্য অনেকটা মাথার ওপরে। তাই লেকের জল কিছুটা যেন কম রঙিন। এমনিতে বলা হয় মেনমেচো লেকের রঙ প্রতি মিনিটে বদলায়।

বাবা মন্দির

পড়ন্ত বিকেলের আলোয় রুপোলি মেনমেচো

কুপুপ দেখে যখন ইন্দো-চায়না বর্ডার অঞ্চলে ছিলাম, গাড়িতে কয়েকজন কর্মরত সিকিম পুলিশ উঠে এসেছিলেন। চন্দুভাই-এর সঙ্গে নেপালিতে কী কথা বলছিলেন তাঁরা, প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে হিন্দিতে ওঁরাই আমাদের বুঝিয়ে বললেন যে, সঙ্গে সিকিম পুলিশ না গেলে সেনাবাহিনী থেকে পারমিট দেবেনা মেনমেচো ঢোকার জন্য। প্রায় সাত কিলোমিটার রাস্তা আগে পায়ে হেঁটে নামতে হত। এখন গাড়িতেই নামা-ওঠা করা যায়। যাই হোক, আমি তো মেনমেচো প্রথম দেখে আনন্দে বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। ক্যামেরায় ছবি তুলব কী, এরকম জায়গা থাকতে পারে তা কল্পনার জগতেও কখনও আসেনি! অসম্ভব সুন্দর। দেখার পর ভাষায় প্রকাশ করাই কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু আসতে হলে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয় প্রথমেই বলেছি। সিকিমের ফিশারি ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা কাঠের কটেজ করা আছে। সেখানে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা আছে। কিন্তু কোনওরকম ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা নেই, আর কটেজের ভিতরে জলেরও কোনও ব্যবস্থা নেই। শুধু জঙ্গলকে উপভোগ করা আর ওই নির্জনতায় নিজেকে খুঁজে পাওয়া।

এই জঙ্গলে মাত্র দুটি মানুষ থাকেন। লালিদাজু আর তার স্ত্রী। লালিদাজু বারো বছর এখানে চাকরি করছেন। ফিশারি ডিপার্টমেন্টের কেয়ারটেকার। মেনমেচো লেক সিকিম গভর্নমেন্টের ট্রাউট মাছের চাষের একমাত্র জায়গা। এই জঙ্গলে এত বছর থাকতে থাকতে তাঁদের জীবনটাও প্রকৃতির মতনই সুন্দর হয়ে গেছে। অতিথি এসেছে তাঁদের ওই ঘন জঙ্গলের বাড়িতে। এখান থেকে কুপুপ প্রায় সাত কিলোমিটার। হেঁটে দেড় থেকে দু'ঘন্টা মত সময় লাগে। তাই এই দুজন ওই জঙ্গলে অন্য কোনও মানুষের দেখা পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। কী খাওয়াবেন প্রথমে তো বুঝে উঠতেই পারছিলেন না। তারপর ভাত, ডাল, ডিম রান্না করে দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন দুজনে মিলে। লালিদাজুর স্ত্রী বেশ সুন্দরী, ঠান্ডায় ফর্সা গাল দুটো লাল হয়ে থাকে। বয়সের ভারে একটু ধীর হয়ে গেছেন। ওদের দুজনকে দেখে অবাক হওয়া ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। এই জঙ্গলে দুটো মানুষ তাঁদের জীবনের বারোটা বছর হাসতে হাসতে কাটিয়ে দিলেন! না পাওয়া যায়

প্রয়োজনমত সাংসারিক জিনিসপত্র, না আছে ডাক্তার, না আছে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি কথা বলার। সাত কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে গেলে তবে সব পাওয়া যাবে। আর যদি কখনও সেনাবাহিনীর গাড়ি এসে তাঁদের খবরাখবর নিয়ে বা দিয়ে যায় তবেই তাঁরা বাইরের জগতের খবর পান। অথচ দুটি মানুষের মধ্যে অসম্ভব প্রেম। একজন আর একজনকে আগলে রেখেছেন, প্রকৃতি যেমন পাহাড়ের প্রতিটি গাছগাছালিকে আগলে রাখে।

লালি দাজুর কুটির

সেই জঙ্গলে যখন রাত নামে সে অপূর্ব। সেদিন পূর্ণিমা। কাঠের ঘরে লাল পাতলা পর্দা আর সেই পর্দা চুঁইয়ে জোৎস্না পড়ছে। পুরো ঘরটিকে আলোকিত করে রেখেছে। প্রচণ্ড ঠান্ডার মাঝে এক অপরূপ মায়াবী রাত। ইলেকট্রিকের আলো নেই, কিন্তু চাঁদের আলোয় ঘরের প্রতিটা জিনিস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এমনকি টেবিলের ওপর আমার ছোট্ট কানের দুলটাও জ্বলজ্বল করছে। সিকিম পুলিশের অফিসাররা, চন্দুভাই, আমাদের যে গাড়িটা ছিল তার ড্রাইভার কারমা ভাই সবাই আমাদের

ওই জঙ্গলে লালিদাজুর হাতে সমর্পণ করে ফিরে গেছেন। সন্ধ্যায় ঘুরতে ঘুরতে লালিদাজুর স্ত্রী, ভাবীর কাছ থেকে শুনছিলাম তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা। ভাবী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাতের খাবার তৈরি করতে। আর আমি বসে তাঁর ঘরটা অবাক হয়ে দেখছি আর ভাবছি, আমাদের চাওয়ার শেষ হয় না আর এরা দিব্যি না পাওয়াতেও হাসিখুশি জীবন কাটায়! তাহলে ভগবান কাকে ভাগ্যবান করে পাঠাল, আমাকে না এই ভাবীকে?

এইসব ভাবতে ভাবতে গাটা সবে এলিয়েছি ভাবীর ছোট্ট ঘরের একটা চৌকির একপাশে, হঠাৎ দেখি তিনজন অল্পবয়সি ছেলে ঘরে ঢুকে ভাবীর সঙ্গে কী কথা বলছে, আর অনেক বাজার নামিয়ে রাখছে। ডিম, চিকেন, ভাত, ডাল, রুটি ওই রাতে এলাহি খাবার। গ্রামের ছেলে ওরা, তিন বন্ধু। আর সঙ্গে এনেছে তাদের পোষ্য কুকুর ববিকে। ওই গভীর অরণ্যে তিন বন্ধু আসাতে আমার মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে উঠল। অন্ততঃ আড্ডা তো হবে অনেক। তারপর সবাই মিলে হুল্লোড়, গান, বাজনা, খাওয়া-দাওয়া রাতের অরণ্যকে এরকম প্রাণ ভরে উপভোগ এর আগে আমি কখনও করিনি। চারদিক ভাসিয়ে দেওয়া জোৎস্নার আলোয় মায়াবী সেই রাত। বাইরের তাপমাত্রা প্রায় এক-দু ডিগ্রি হবে। হিমশীতল হাওয়ায় মাথার চুল পর্যন্ত কেঁপে উঠছে যেন। এমন কনকনে। লালিদাজুর কাঠের ঘরের কাঁচের জানলাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক বিশাল পাহাড়, যেন ওই অন্ধকার রাতে আমাদের পাহারা দিচ্ছে। প্রকৃতিকে ভালবাসলে সে তার চারগুণ বেশি ভালবাসা ফিরিয়ে দেয়, এ আমার চিরকালীন বিশ্বাস। যে জায়গাটা এখনও পর্যটকের উপযুক্ত নয়, কোনও পর্যটককে সেনাবাহিনী থেকে সহজে থাকার অনুমতি দেয় না, সেখানে আমরা আছি, এটাও তো একটা প্রকৃতির দেওয়া আশ্চর্য উপহার।

খাওয়া, হুল্লোড়, আড্ডার শেষে লালিদাজু, ভাবী এবং সেই তিন বন্ধুকে শুভরাত্রি জানিয়ে যখন আমাদের থাকার কটেজে শুতে গেলাম, টের পেলাম ঠান্ডাটা। দরজা খুলে অন্ধকার কাঠের বাড়িটায় ঢুকছি, দরজার ক্যারক্যার আওয়াজেই আমার বুকটা পুরো শূন্য হয়ে গেল ভূতের ভয়ে। এই গভীর পাহাড়ি জঙ্গলে পাশের আরও দুটো কাঠের বাড়ি পুরো ফাঁকা, রাতের অন্ধকারে সেদিকে তাকালে গাটা আর একটু বেশি মাত্রায় ছমছম করে ওঠে। জোৎস্নায় যেন আরও অতিপ্রাকৃতিক করে তুলছিল পরিবেশটাকে। মোমবাতি নিয়ে গল্পের বইয়ের ভূতুড়ে বাড়ির কাঠের সিঁড়ির মতন সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে কোনোমতে ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে সেই যে চোখ বুজেছিলাম, ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙেছিল।

বাইরে তখনও অন্ধকার। লালিদাজু বলেছিল একটু আলো না ফোটা অবধি লেকের দিকে না যাওয়াই ভালো। আলো ফুটলে তবেই যেতে এবং জোরে জোরে কথা বা গান করতে করতে যেতে। অনেক সময় বুনো শুয়োর বা ভাল্লুক এসে পড়ে। শিয়ালও দেখা যায় মাঝেসাঝে। সকাল ছটা নাগাদ হাঁটা লাগালাম লেকের দিকে। গাছের গায়ে শিশির জমে সাদা হয়ে আছে। চলার পথের পাশে লেকের শুরুর অংশ কিছুটা জমে কাঁচের মতন দেখাচ্ছে। তখনও সূর্যের আলো এসে পড়ে নি। পাহাড় টপকে সূর্যের আলো লেকে পড়তে পড়তে প্রায় আটটা বেজে যায়। ফিরে এসে লালিদাজুর ঘরে বসলাম গরম গরম চা হাতে নিয়ে। আর বারবার জানলা দিয়ে দেখতে লাগলাম সূর্যের আলো পড়ল কিনা। ঠিক আটটা ঘড়ির কাঁটায়, অমনি আলোর ঝিলিক। বুঝলাম আগেকার দিনের মানুষের কেন ঘড়ি লাগত না। সূর্য যেন হাসতে হাসতে আলোর কিরণ ছড়িয়ে লেককে করে তুলল সুন্দরী মেনমেচো। চায়ের কাপ নামিয়ে দৌড় লাগালাম সেদিকে। লেকের পাড়ে গিয়ে দেখি জলের স্রোতের সঙ্গে সূর্যের আলোর কিরণের প্রেমালাপ চলছে। যেন সূর্য তার কিরণের মুক্তো ছড়িয়ে লেককে করে তুলেছে আরও অপরূপা।

এখানে পাহাড়, জঙ্গল প্রতিদিন অপেক্ষা করে থাকে মায়াবী রাতের শেষে এমন একটি ভোরের জন্য।

~ *সিকিম সিল্করুটের আরও ছবি* ~

সুপর্ণা ভালোবাসেন ঘুরতে। অবশ্যসঙ্গী ক্যামেরা। বিশেষ প্রিয় গন্তব্য পাহাড়। ভালো লাগে জঙ্গল আর সমুদ্রও। তবে প্রচলিত ভিড়ের বাইরে। অল্প চেনা বা অজানা জায়গাতে গিয়ে নিজের মতন করে কিছু খুঁজে পাওয়ার নেশাতেই ছুটির অবকাশ খোঁজে তাঁর মন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

হো চি মিনের ভিয়েতনামে

রাইসুল সৌরভ

~ ভিয়েতনামের আরও ছবি ~

গত জুনের মাঝামাঝি ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে এশিয়ার একটি আন্তর্জাতিক আইনসমিতির আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই সম্মেলনের ওয়েবসাইটে একটি গবেষণা প্রবন্ধের সারাংশ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম দুরুদুরু বুকে। কিছুদিন পরে ওপার থেকে সাড়া এল সম্মেলনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিতে। ভিয়েতনাম সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার সেই শুরু। এমনিতে খুব একটা ধারণা ছিল না দক্ষিণ চীন সাগরের পাড়ে বিস্তৃতির পাখা মেলে শুয়ে থাকা লম্বাটে দেশটি সম্পর্কে। শুধু জানতাম তৈরি পোশাক খাতে এই দেশটি আমাদের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী! চাল রপ্তানিতে দ্বিতীয় কৃষি প্রধান এক দেশ, যারাও নাকি উন্নয়নের মিছিলে শামিল হতে বাংলাদেশের মতই ছুটছে প্রাণপণে। ইন্টারনেট ঘেঁটে আরও জানলাম চলতি সময়ের লু হাওয়াও আমাদের মতোই সেখানেও উষ্ণতার পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে সর্বত্র।

ভিয়েতনাম ভ্রমণে তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রয়োজন পড়ে। আয়োজকদের মাধ্যমে সেসব জোগাড় করে ভিসাপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা। অবশেষে অপেক্ষার প্রহর শেষ করে ১৩ তারিখে পিঠে দুটি ডানা লাগিয়ে হ্যানয়ের পথে উড়াল দেয়া।

ঢাকা থেকে হ্যানয় সরাসরি ফ্লাইট না থাকায় যাত্রা বিরতিসহ আকাশে উড়ে উড়েই চলে গেল বার ঘণ্টা। তাই সূর্য যখন হ্যানয়ের মধ্য গগনে তখন যেয়ে নামলাম নৈ বেই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। নেমেই দে ছুট সম্মেলনপানে। সম্মেলন যে শুরু হয়ে গেছে আগের রাতেই! বিমানবন্দর থেকে শহরের দিকে যেতে যেতেই মুগ্ধ করল হ্যানয়। প্রশস্ত, পরিষ্কার রাস্তা। ঢাকার মত অসহ্য জট নেই; অযথা ভেঁপুর আওয়াজ নেই। রাস্তার পাশ দিয়ে উদ্যান, ফাঁকা মাঠ, অদূরে অনুচ্চ দালান। এদের বেশিরভাগ বাড়ির বৈশিষ্ট্য হল ওপরের তলার ছাদ টিনের চালের মতো মাঝখানে উঁচু হয়ে দুধারে ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া। ঢাকার মতো সুউচ্চ ঘিঞ্জি বিল্ডিং না থাকলেও তাতে আভিজাত্যের কমতি নেই। সাধারণেই সে অসাধারণ!

আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা

যে কোনও সম্মেলনের উপরি পাওনা হল নানা দেশের, নানান বর্ণের, জাতের মানুষের সঙ্গে সংস্কৃতির আদান-প্রদান হয়ে যাওয়া। সম্মেলনের আয়োজক প্রতিষ্ঠান এশিয়াকেন্দ্রিক হলেও অংশগ্রহণকারীর দল মোটেই এশিয়াতে সীমাবদ্ধ ছিলনা; বরং তাবৎ দুনিয়ার বৈচিত্রের মেলবন্ধন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল সেখানে। মূলত আন্তর্জাতিক আইনের বহুমাত্রিকতা এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বে আগামী দিনে আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব ও অবস্থানই ছিল মূল আলোচ্য বিষয়। সম্মেলনে যোগ দিয়ে নিজের গবেষণাকর্ম সবার সামনে তুলে ধরা মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এ যাত্রার অন্যতম বড় অনুষঙ্গ ছিল ভিয়েতনামের মানুষ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে নিজের পরিচয় ঘটানো।

যে ভাবনা সেই কাজ। যাত্রার শুরুতে প্রস্তুতি ছিল হ্যানয় এবং তার আশপাশের অনন্য নিদর্শনসমূহ ঘুরে দেখা। কিন্তু হ্যানয়ে পা রেখে জানলাম ভিয়েতনামের বিখ্যাত নেতা হো চি মিনের নামে নাম রাখা শহরে না গেলে ভিয়েতনাম ভ্রমণ যে বৃথা। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত; আর কাল বিলম্ব নয়, সেদিন রাতেই হো চি মিনের পানে ডানা লাগিয়ে আবার উড়াল দেওয়া। আসলেই তাই; হো চি মিনের সঙ্গে হ্যানয়কে মেলানো দায়। সচরাচর যা ঘটে এখানে তার উল্টো। হ্যানয় কাগজে কলমে ভিয়েতনামের রাজধানীর তকমা পেতে পারে; কিন্তু ভিয়েতনামের পর্যটনের রাজধানীর নাম হো চি মিন! হ্যানয় কিছুটা শান্ত-নিরিবিলি শহর। আর পাঁচটা রাজধানী শহরের মত না। রাত দশটা নাগাদ সেখানে নেমে আসে নির্জনতা। আর তার ঠিক উল্টো হল হো চি মিন। সে শহর কখনও ঘুমায় না; বরং রাতে তার রূপ উপচে পড়ে। সমস্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাস রাতের অপেক্ষায় প্রহর গোনে। আর সমগ্র শহরের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণবন্ত যে জায়গা তার নাম ভুই বেন। কপালগুণে আমাদের আবাসও সেই ভুই বেনে। মধ্যরাতে হো চি মিনের মাটি স্পর্শ করার পর কিসের নিস্তব্ধতা? সমস্ত যৌবন নিয়ে যেন এ শহর পর্যটকদের আগমনকে স্বাগত জানানোর জন্যই অপেক্ষায় রয়েছে। সেই রাতেই তাই আশেপাশের এলাকা ঘুরে দেখা এবং বিনোদনের সকল আয়োজন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা!

কয়দিনের যাত্রা ক্লান্তির সঙ্গে সকালের অলস ঘুম যোগ হওয়ায় পরদিন তাই হোটেলের ব্যবস্থাপনায় শহর দর্শনের আয়োজন মিস করে উপায়ান্ত না পেয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ভিয়েতনাম যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ দেখতে ছুটে চলা। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কী প্রতাপের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করে ভিয়েতনামের উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে এনেছিল তারই সাক্ষী যুদ্ধাবশেষ জাদুঘর। ভিয়েতনামে সমাজতন্ত্রের উত্থানে আতঙ্কিত যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে ফ্রান্সকে লেলিয়ে দিয়ে সুবিধে করতে না পারায় পরবর্তীতে নিজেই দেশটির উপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে দখলের অপচেষ্টার নিমিত্তে সাধারণ নাগরিকদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ৬৬-তে শেষ হলেও বাংলাদেশকেও যুক্তরাষ্ট্রের মদতে একই ধরণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে দিনানিপাত করতে হয়েছিল। জাদুঘরের একপ্রান্তে স্পষ্ট বাংলায় লেখা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)'র একটি শুভেচ্ছা বার্তা "বিজয়ী ভিয়েতনাম লাল সেলাম, হো চি মিন লাল সেলাম" শোভা পাচ্ছে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে

মিউজিয়ামে বাংলা পোস্টার

বাংলা পোস্টার শোভা পেতে দেখা যে কী গর্বের তা এর আগে অনুভূত হয়নি। জাদুঘরের একপ্রান্তে যুদ্ধবন্দীদের অত্যাচারের সামান্য নিদর্শন প্রদর্শনের ব্যবস্থা। আর আছে আমেরিকার ব্যবহৃত সমরাস্ত্র। দেখলে বিস্ময়ের ঘোর কাটে না; এই বিশাল অস্ত্রের মুখে দরিদ্র ভিয়েতনাম কিভাবে জয় ছিনিয়ে এনেছিল? আসলে অন্যায্য যুদ্ধ যুগে যুগে নিঃস্ব-দরিদ্রের মনোবলের কাছে কালে কালে পরাভূত হয়। যেমনটা হয়েছিল ৭১-এও!

জাদুঘর ঘুরে দেখে শেষ করে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলা কু চি গুহার দিকে। শহর থেকে বাসে প্রায় দু ঘণ্টার যাত্রাপথ কু চি টানেল। টানেল দেখতে যাওয়ার পথে দেখা হল যুদ্ধের ক্ষত বয়ে নিয়ে বেড়ানো বর্তমান প্রজন্মের ভিয়েতনামীদের তৈরি কারুপণ্য ও উৎপাদন কৌশল। তবে টানেল দর্শন স্মরণীয় হয়ে থাকবে ভিয়েতনামীদের গুহা তৈরির কৌশল বা সেখানে কাটানো জীবন বা যুদ্ধ জয়ের রণনীতি জানার জন্য নয়, বরং আমাদের গাইডের নিদারুণ বর্ণনা, দেশের প্রতি তার মমত্ব, চূড়ান্ত রকমের মজা করতে জানা আর তার ইতিহাস জ্ঞানের দরুণ! কী করেনি সে? যেমন চোস্ত তার ইংরেজি, তেমন গানের গলা; তেমনি সে জানিয়েছে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট। ভিয়েতনামীদের সম্পর্কে ধারণা দিয়ে, একই শহরের দুই নামের ইতিহাস জানিয়ে আর তাঁর প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব দিয়ে সে মুগ্ধ করেছে আমাদের। গাইড হলে এরকম-ই হওয়া উচিৎ। অথচ প্রথম দেখাতে মনে হয়েছিল অশিক্ষিত বাসকর্মী হয়তো এক!
ভিয়েতনামীরা ইংরেজিতে খুব একটা পারঙ্গম না, তাতে আপাত অসুবিধা হলেও যোগাযোগ থেমে থাকে না। সবকিছুর শেষে দিনান্তে মানুষে মানুষে যোগাযোগের পথে ভাষা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে না। নইলে এই ভরা গ্রীষ্মে ভিয়েতনামে কেন পর্যটকে গমগম করবে? আফসোস হয় শুধু যখন দেখি ঈশ্বর আমাদেরকেও করুণা করতে কার্পণ্য করেননি; কেবল নীতিনির্ধারকদের উদাসীনতায় পর্যটনশিল্পের যে বিশাল বাজার, সে বাজারে আমরা এখনও অপাঙক্তেয়!

কু চি টানেলের প্রবেশপথে

হো চি মিন শহরের পূর্ব নাম সাইগন। এখনও কেউ কেউ সে নামে তাকে ডাকে। হো চি মিন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে জানিয়ে গিয়েছিলেন সাইগন তাঁর জন্মভূমি না হলেও তিনি সাইগনেরই সন্তান এবং সাইগন একদিন ভিয়েতনামের অংশ হবেই। তখন তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাইলে যেন সাইগনের নাম হো চি মিন নামে নামাঙ্কিত করা হয়। সেই থেকে এ শহর দুই নামেই পরিচিত। তবে ভিয়েতনামীদের যে গুণের প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে তা এঁদের সারল্য এবং পরোপকারিতা। জাতি হিসেবে যথেষ্ট সভ্য। নইলে কী আর রাতের বেলা ফাঁকা রাস্তায় কেউ ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলে? অন্তত এ বেলায় বাঙালির মতো অসভ্যতা দেখান না তাঁরা। আর যে বিষয়ে এঁরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা হল ট্যাক্সি ব্যবস্থাপনায়। মুঠোফোনে অ্যাপের মাধ্যমে যেকোন শহরেই ট্যাক্সি ডাকার মিনিট ছয়েকের মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছে দিতে ট্যাক্সি আপনার দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হবে। সবই মিটার ট্যাক্সি, তাই অযথা দরাদরির কোন প্রয়োজন পড়ে না। বাংলাদেশের তুলনায় ট্যাক্সিসেবা অনেক সস্তাও বটে। অথচ এই পোড়া দেশে ট্যাক্সির টিকিটিও দেখতে পাওয়া এখন ভাগ্যের বিষয়। আর খরচ এবং দামাদামির প্রসঙ্গ না হয় না-ই তুললাম। যে দেশের বিমানবন্দরে নেমে ঠিকমতো ট্যাক্সসেবাটিই পাওয়া যায় না, সে দেশের অপরিচিত গন্তব্যে যেতে অচেনা কোনও ভিনদেশি কোন ভরসায় আসতে চাইবে?

হো চি মিন সিটির পথে

তবে ভিয়েতনামে সে অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন হয়নি। নারীরা নীতিনির্ধারণে এখনও উপেক্ষিত। ভিয়েতনামী ছেলেরা বয়স্ক বা মোটা মেয়েদের বিয়ে করতে চায় না। কন্যার পিতাদের তাই মেয়েকে রোগা রাখতে তটস্থ থাকতে হয়। তবে নারীরা ওখানে পুরুষের তুলনায় দুর্দান্ত পরিশ্রমী এবং কর্মঠ। সন্তান লালন, ঘরের কাজ এবং উপার্জন সমান তালে করে যান তাঁরা! তবে এঁরা অন্যদের মতো কারও সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তথাকথিত ভদ্রতা দেখান না। প্রথম দেখাতেই তাই বয়স জানতে চাইবেন। কারণ বয়সে বড় হলে তাঁকে এক নামে সম্বোধন করে সম্মান জানাবেন আর ছোট হলে ভিন্ন নামে ডেকে হৃদ্যতা বাড়াবেন। কত টাকা বেতন পায় তাও নির্দ্বিধায় শুধাবেন। কারণ যে বেশি আয় করে সে চেষ্টা করবে অন্যের জন্য ভাল আয়ের ব্যবস্থা করার। এই হল ভিয়েতনামীদের স্বভাব! এঁদের বেশিরভাগই নির্দিষ্ট কোনও ধর্মের অনুসারী নন। পূর্বপুরুষদের পুজো করাই তাঁদের ধর্ম। ক্ষুদ্র কিছু জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মানুসারী। এসবই আমাদের মহান গাইড এ্যালেক্সের কাছ থেকে ধার করা জ্ঞান নিয়ে বর্ণনা করা। তবে এঁদের নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই আর কিছু না থাকলেও একটি করে স্কুটি আছে। স্কুটিই তাদের মূল বাহন। ধনীদের অবশ্য নিজস্ব গাড়ি রয়েছে। গাড়ি এখানে আভিজাত্যের প্রতীক। সঙ্গত কারণেই তাই গণপরিবহন সেভাবে চোখে পড়েনি।

আবার ফিরে আসা যাক যুদ্ধ গুহার গল্পে। মূলত ফ্রান্স যুদ্ধের সময় শুরু হয়েছিল কু চি-র গভীর জঙ্গলে প্রায় ২৫০ কি.মি. দীর্ঘ গুহা তৈরির কাজ যার আরও বিস্তৃতি ঘটে মার্কিন আগ্রাসনের সময়। কু চি হল বিষাক্ত গাছ। কু চি বৃক্ষের আধিক্য থাকায় মার্কিনিরা এই এলাকার নামও সে অনুসারে রেখেছিল। যোদ্ধারা গুহার মধ্যেই জীবন যাপন করত। তাদের প্রাত্যহিক কর্মাদি, খাওয়া-দাওয়া, যুদ্ধপরিকল্পনা সবই চলত গুহাতে। সেনারা ব্যবহার করতো টায়ারের তৈরি জুতো। প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দিতে যার অগ্রভাগ হতো বিস্তৃত আর পশ্চাৎ সূচালো। গুহায় কোন মার্কিন সেনা প্রবেশ করলে জুতোর গন্ধে প্রতিপক্ষকে চেনা যেত। কারণ টায়ারের জুতো গন্ধ ছড়াত না, অন্যদিকে বৃষ্টিস্নাত এলাকায় মার্কিনিদের জুতো ভিজে দুর্গন্ধ ছড়াত; ফলে আলোবিহীন গুহায় সহজেই শত্রু ঘায়েল করা যেত। এছাড়াও গুহার চারপাশে বিভিন্ন জায়গায় গুপ্ত ফাঁদ পাতা থাকত শত্রুদের বাগে আনতে। যুদ্ধ গুহার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল শ্বাসরুদ্ধকর! ভ্রমণপিপাসুদের জন্য বর্তমানে ২০ মিটারের মতো ভ্রমণের ব্যবস্থা রয়েছে। তা পাড়ি দিতেই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা!

কু চি টানেলের বাইরে

কু চি টানেলে গেরিলা যোদ্ধার মডেল

যুদ্ধ-বিগ্রহের নিদর্শন দর্শন শেষে হোটেলে ফিরে পরের দিনের ভ্রমণের বন্দোবস্ত করে উদভ্রান্তের মতো শয্যার জোগাড়যন্তর করা। কিন্তু হায়! বিধি বাম। পরেরদিন সকালে আমার সফরসঙ্গী এই শহরে এক বাঙালির দেখা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সফরের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে ছুটে চললো তার আবাস পানে। আসলে বেচারা এই কয়টা দিন ভিয়েতনামের অপরিচিত রসনায় অর্ধাহারে-অনাহারে কাটিয়ে বাঙালির দেখা পেয়ে তার দেওয়া গরুর মাংস ভুনা খাওয়ার নিমন্ত্রণ ফেলতে পারেনি। ফলস্বরূপ ভ্রমণ শিকেয় উঠলেও আগে থেকে নিশ্চিত করায় নির্ধারিত ফি থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। যাই হোক, অত:পর দেশি ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাংলায় প্রাণখুলে কথা চালিয়ে তার স্থানীয় বন্ধুর সহায়তায় দিনভর চললো টুকটাক কেনাকাটা। বেলাশেষে পুনরায় হ্যানয়ে পথে উড়াল দেয়া।

ভিয়েতনাম সফরের শেষদিন ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য হা লং বে-র অপরূপ রূপের আস্বাদনে বাস যোগে প্রাতেই গমন করা। প্রায় তিন ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে সে রূপের লেশ দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হল! প্রকৃতি যেন রূপের ডালি সাজিয়ে বসে আছে হা লং বে-তে। ছোট-বড় প্রায় দুই হাজার দ্বীপ রয়েছে এই উপসাগরে। যাদের নামও বেশ অদ্ভুত! একটার নামতো মোরগ যুদ্ধ দ্বীপ! হা লং বে'র এক পাড়ে রয়েছে পর্যটকদের জন্য কায়াক চালানোর ব্যবস্থা। দু'জন মিলে কায়াক চালাতে চালাতে পাড়ি দিয়ে দেওয়া যায় ছোট্ট সুড়ঙ্গ। কী চমৎকার সে নিসর্গ!

শহুরে জীবনের সমস্ত ক্লান্তি ভুলে ডুব দিতে মন চায় হা লং বে'র স্বচ্ছ জলে। জাহাজে ঘুরতে ঘুরতে আর মধ্যাহ্নভোজন সারতে সারতে সাগরের রূপ চুপি চুপি আস্বাদন করার মধ্যে যে স্বর্গীয় প্রশান্তি রয়েছে তা এই প্রথম উপলব্ধি করার সৌভাগ্য হল। তবে বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। সাগর পাড়ে রয়েছে বিভিন্ন প্রাণীর অবয়ব নিয়ে বিশাল সুড়ঙ্গ। জেলেরা বাঁদরের দলকে অনুসরণ করে এই সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেছিল। সুড়ঙ্গটি চমৎকারভাবে সাজিয়েছে পর্যটন কর্তৃপক্ষ এবং তুলে ধরেছে ভিয়েতনামী ঐতিহ্য।

হা লং বে

তবে ভিয়েতনাম সম্বন্ধে যে প্রসঙ্গ না পাড়লে এ ভ্রমণ কাহিনি অসম্পূর্ণ থাকবে তা হল তাদের মুদ্রা। এদের মুদ্রার নাম ভিয়েতনাম ডং বা সংক্ষেপে VND। যার সর্বনিম্ন নোটটি ১০০০ মূল্যমানের এবং সর্বোচ্চটির মূল্যমান ৫০০০০০ মাত্র! নোটের অঙ্ক থেকেই অনুমেয় কতটা মূল্য আসলে নোটগুলি বহন করে! বঙ্গ টাকার একটি নোটের বিনিময়ে এদের প্রায় ২৮৫টি নোট পাওয়া যাবে আর শত ডলারের মার্কিন মুলুকের নোটের বিনিময়ে পাওয়া যাবে ২২.৩ মিলিয়ন ডং! এখানে আসলে তাই ডংয়ের হিসাব মেলাতে কিছুটা বিপত্তিতে পড়তে হয়। উপায়ান্ত না দেখে দোকানি কিংবা ড্রাইভারের সহায়তা নেওয়া। সব ডং তার দিকে বাড়িয়ে দিলে সে তার প্রয়োজন মিটিয়ে বাড়তিটা আবার ফিরিয়ে দেয়। অর্ধ লিটারের এক বোতল পানির দাম এখানে ১৮০০০ ডং! এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল পর্যন্ত ট্যাক্সি ভাড়া নিয়েছিল সাড়ে তিন লক্ষ ডং। কিছু ক্ষেত্রে সে অঙ্ক কোটিতেও যেয়ে ঠেকে যেমন ল্যাপটপ বা ফোন কেনার মতো মামুলি ব্যাপারে! তবে উপায় একটা এতদিনে বের হয়েছে। এরা সাধারণত শেষ তিনটি শূন্য আর বলে না। ফলে ব্যাপারটা বেশ সোজা হয়ে যায়। আবার শেষ তিনটি শূন্যের আগে পয়েন্ট(.) লেখা থাকে। ব্যস, গেল ল্যাটা চুকে। যেমন খেয়ে দেয়ে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ডংয়ের বিল বানালে এরা বলে একশো তিরিশ।
তবে শুধু আমরা না; অনেক পর্যটককেই দেখেছি নতুন এসে ডংয়ের হিসাব মেলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। অবশেষে ত্রাতা হয়ে পাওনাদারকেই কাছা দিয়ে ডংয়ের হিসাব মেলাতে মাঠে নামতে হচ্ছে।
সব মিলিয়ে স্বল্প সময়ের ভিয়েতনাম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এক কথায় অসাধারণ। মনের স্মৃতিপটে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে কফি উৎপাদনের

অন্যতম শীর্ষে থাকা এই আসিয়ান সদস্য। এই কয়েকটা দিনে ভিয়েতনাম যা দিয়েছে, তা সহজে ভোলার নয়। নতুন মানুষ, মূল্যবোধ, সভ্যতা, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটা সব সময়ের জন্যই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতার মুকুটে নতুন পালক যোগ করলো মায়াবী ভিয়েতনাম আর তার সরল মানুষগুলো।

~ *ভিয়েতনামের আরও ছবি* ~

ভ্রমণপিপাসু রাইসুল সৌরভ ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সমন্বয়ক। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবীও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

অল রোডস লিড টু রোম

শ্রাবণী ব্যানার্জী

~ রোমের আরও ছবি ~

জানি না কেন সেই ছোটবেলা থেকেই 'ভিনি ভিডি ভিসি' - এই তিনটি লাতিন শব্দ আমার কানে ছন্দের মত বাজত। শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার পড়তে পড়তে বারবার মনে হত কোথায় সেই রোম যেখানে থাকতেন সেই যুদ্ধবিজয়ী নায়ক যিনি বলেছিলেন এলাম দেখলাম ও জয় করলাম?

জুলিয়াস সিজার থেকে জুলাই মাসটা এসেছে শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম, আবার পরক্ষণেই মনে হয়েছিল হায়! একই মাসে জন্ম হয়েও আমাদের দুজনের মধ্যে কত ফারাক! অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রার মত প্রেমিক প্রেমিকাদের কাহিনি পড়তে পড়তে মনটা যেন সেই অতীতের রোমেই পাখা মেলে চলে যেত। এই ভাবেই বড় হয়ে 'অল রোড লিডস টু রোম' মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে আমিও জীবনে দুবার রোম শহরে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

বহুবছর আগে দেখা রোমের স্মৃতি অনেকটাই ঝাপসা হয়ে আসছিল তাই কয়েক বছর আগে আগস্ট মাসে ছেলেকে নিয়ে আবার রোমের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলাম। রোমের ইতিহাস এতটাই বড় ও প্রাচুর্যময় যে লিখতে গেলে কোনও থই পাওয়া যাবে না। দুহাজার বছর আগের 'জুলিয়াস সিজার' নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিটলারের ধামাধরা 'মুসোলিনি' - কোন ডিকটেটরকে ফেলে কাকে ধরব কিছুই বুঝতে পারি না।

শোনা যায় রোম নামটা আসে রোমুলাস থেকে। সে ও তার ভাই রোমাস দুজনেই ছিল রোমান দেবতা মার্স-এর ছেলে। এক সময় রাজত্বের লোভে ভাই রোমাসকে খুন করে রোমুলাস ছোট ছোট সাতটি পাহাড়ের ওপর রোম প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম থেকেই রোমানরা সব কিছুতেই গ্রিকদের নকল করত, মায় দেবতাদের পর্যন্ত। গ্রিক দেবতাদের সর্বময় কর্তা ছিলেন 'জিউস', তিনিই হলেন রোমানদের 'জুপিটার'। গ্রিক সমুদ্র দেবতা 'পোসাইডন' ও রোমান্টিক নারী দেবতা 'আফ্রোদিতি' যথাক্রমে রোমানদের কাছে হয়ে গেল 'নেপচুন' ও 'ভেনাস'। রোমানরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করত কী শিক্ষাদীক্ষায়, কী সংস্কৃতিতে, কী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় গ্রিকদের সমকক্ষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তাই একশো ছেচল্লিশ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিস জয় করার পর ক্রীতদাস হিসাবে ধরে আনা এই গ্রিক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও গণিতজ্ঞদের চিন্তাধারা কাজে লাগিয়েই রোমানরা একসময় সারা ইউরোপ জুড়ে রাজত্ব করেছিল।

টাইবার নদীর ধারে সাত পাহাড়ে ঘেরা জায়গাটা প্রথম থেকেই লোকজনকে আকৃষ্ট করে। তবে সত্যিকারের রোমান ইতিহাস আরম্ভ হয় আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে যখন রোমান রিপাবলিকের জন্ম হয়। 'ডেমোক্রেসি' বা গণতন্ত্র শব্দটা এরা গ্রিকদের কাছে থেকে শেখে। তারা মনে করত কোনও একটি রাজার হাতে দেশটা পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, তাহলে সে শক্তির অপব্যবহার করবে। তাই তিনশো জন লোক নিয়ে সেই সময়ে জন্ম হয় সিনেটের, যদিও জনসাধারণ ভোট দিয়ে দুজন কনসালকে দাঁড় করাত কিন্তু ক্ষমতার আসল চাবিকাঠি থাকতো এই সিনেটারদের হাতেই। উচ্চবিত্ত লোকেরা নিজেদেরকে বলত 'প্যাট্রিসিয়ান', অর্থাৎ অভিজাত বা আপার ক্লাস। আর সাধারণ লোকেদের তারা নাম দিয়েছিল 'প্লেবিয়ান'।

সাধারণ লোকেরা যখন খেয়াল করল প্রায় দুশো বছর ধরে তাদের হাতে কোনও ক্ষমতাই নেই, অর্থাৎ যা কিছু নিয়ন্ত্রণ সবই প্যাট্রিসিয়ানদের হাতে তখন তারা ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহ করল আর ঠিক সেই সময়েই বিভিন্ন যুদ্ধ জয় করে তাদের লিডার হয়ে এল জুলিয়াস সিজার। গল অর্থাৎ এখনকার ফ্রান্স জয় করার পর সিজারের প্রতিপত্তি এতটাই আকাশছোঁয়া হয়ে যায় যে সিনেটাররা তাকে উপাধি দেয় ডিকটেটর অর্থাৎ যে সর্বেসর্বা। ক্ষমতায় আসার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি গরিবদের ট্যাক্স কমিয়ে ও বড়লোকদের ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়ে পয়সাওয়ালা সিনেটারদের চটিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, সুন্দরী ক্লিওপেট্রার মোহে পড়ে ঈজিপ্টের মত জেতা রাজ্যটা যখন আবার ক্লিওপেট্রার হাতেই ছেড়ে দিলেন, সিনেটাররা আর সহ্য করতে না পেরে খ্রিষ্টপূর্ব চুয়াল্লিশ সালে জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করল।

জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর পর জনসাধারণ তাঁর পালিত পুত্র অগাস্টসকে রোম সাম্রাজ্য চালানোর দায়িত্ব দেয়। এই অগাস্টসই ছিলেন প্রথম সম্রাট যিনি রোমকে খুব সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন। তাঁর সময়েই তৈরি হল পৃথিবীর সব থেকে বড় স্টেডিয়াম যার নাম 'সার্কাস ম্যাক্সিমাস' অর্থাৎ সবথেকে বড় সার্কেল বা বৃত্ত। এই স্টেডিয়ামে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক বসে খেলা দেখতে পারতো যার বেশির ভাগটাই এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। এই অগাস্টস বা অক্টাভিয়ানই প্রথম গরিবদের জন্য আবাসন তৈরি করেন যাতে প্রতিটি মানুষই ভালোভাবেই থাকতে পারে। ওঁর সভাতেই 'হোরেস' ও 'ভার্জিল'-এর মত কবিরা যাতায়াত করতেন, দুঃখের বিষয়ে এই অগাস্টস-এরই বংশধর নিরোর হাতে এসে পুরো রোমই প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। নিরোর এতই কুখ্যাতি যে বলা হয় চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে রোম শহর যখন আগুনে পুড়ছিল তখন নাকি তিনি ফুর্তিতে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। এরপর ট্রাজন ও হেড্রিয়ানের মত আরও কয়েকটি শক্তিশালী সম্রাটের পর ধীরে ধীরে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রাধান্য পেতে থাকে আর তার ফলস্বরূপ এই রাজ্যের ক্ষমতা অনেকটাই আর্চবিশপদের হাতে চলে যায়। অবশেষে চারশো খ্রিস্টাব্দে ভিসিগথ ও ভ্যান্ডালদের মত জার্মান উপজাতির লোকজন এসে পুরো রোমটাই লুটেপুটে ধ্বংস করে দেয়, তাই আজও এই ধরনের কাজকে আমরা ভ্যান্ডালিজম বলে থাকি।

রোমে আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল ছিল 'কলোসিয়াম'। চতুর্দিকে আধুনিক রোম শহরের মধ্যে প্রাচীন রোমের কিছুটা অংশ আলাদা করে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। দুহাজার বছরের পুরোনো এই ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের সামনে দাঁড়ালে নিজের মনটাও যেন সেই অতীতের রোমে চলে যায়। আশি খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ভেসপাচিয়ান এই বিশাল গোল কংক্রিটের স্টেডিয়ামটি তৈরি করেন। তার কিছুদিন আগেই রোমানরা আগ্নেয়গিরির ছাই ও চুন মিশিয়ে পৃথিবীতে প্রথম কংক্রিট আবিষ্কার করে। চতুর্দিকে আর্চ দিয়ে ঘেরা এই চারতলা উঁচু স্টেডিয়ামে একসঙ্গে পঞ্চাশ হাজার লোক বসে খেলা দেখতে পারতো। কংক্রিটের স্টেজের নীচটা ছিল স্টোরেজের জায়গা, সেখানে অন্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ওরা বড় জন্তু জানোয়ারদেরও খাঁচায় পুরে রাখার ব্যবস্থা করেছিল।

রোমানরা কোনও ছোটখাটো জিনিস তৈরি করত না, এদের সবই খুব বড় মাপের, তা সে স্টেডিয়ামই হোক বা জনতার জন্য স্নানাগারই হোক।

সার্কাস ম্যাক্সিমাস

পুরো স্টেডিয়ামটাই দেখলাম বড় বড় আর্চ দিয়ে ঘেরা, যেটা নাকি একসময় সুন্দর সুন্দর স্ট্যাচু দিয়ে সাজানো ছিল। আজও দেখলাম কয়েকটি স্ট্যাচু অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলাবাহুল্য নতুন অবস্থাতে সেটা যে কত সুন্দর ছিল ধ্বংসাবশেষ দেখে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এই স্টেডিয়ামের ভেতরে জল নিয়ে যাবারও ব্যবস্থা ছিল যাতে লোকে নকল জলযুদ্ধ দেখাতে পারে। দুহাজার বছর আগেও রোমান ইঞ্জিনিয়ারিং এতটাই জোরালো ছিল যে অনেক ব্যাপারেই আধুনিক ডিজাইনের সঙ্গে কোনও তফাৎ পাওয়া যাবে না।

এই কলোসিয়ামের স্টেজটাকে ঘন জঙ্গল করে সাজিয়ে তার মধ্যে হিংস্র জন্তু জানোয়ার ছেড়ে তারা নকল শিকারের খেলা দেখাত, আর কখনও বা সেটাকে বাস্তবায়িত করতে দাগী আসামীদের হিংস্র জন্তুদের মুখে ছেড়ে দেওয়া হত। সম্রাটের সামনে এই স্টেজেই গ্ল্যাডিয়েটাররা একে অন্যের সঙ্গে মরণ খেলা খেলত। শোনা যায় সম্রাট ট্রাজন একশো সাত খ্রিস্টাব্দে 'ডাসিয়া' যুদ্ধ জয় করে একশো তেইশ দিন ধরে এগারো হাজার জন্তু ও দশ হাজার গ্ল্যাডিয়েটরের খেলা দেখিয়ে লোকজনকে আনন্দ দিয়েছিলেন। বারবার মনে হচ্ছিল আহা কোনও যাদুবলে এই বিশাল স্টেডিয়ামটাকে যদি গোটা অবস্থায় ফিরে পাওয়া যেত!

কলোসিয়াম

যদিও কলোসিয়ামের পাশেই ঐতিহাসিক রোমান ফোরাম তবুও ঠিক করলাম তাড়াহুড়ো করে না দেখে অন্যদিন হাতে সময় নিয়ে আসব। প্যান্থিয়নের দিকে রওনা দিলাম। গ্রিক ভাষায় এই প্যান্থিয়নের মানে হল সকল দেবতার মন্দির। এই বিশাল গোলাকৃতি ডোমটাই একমাত্র ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। দুহাজার বছর আগেও যে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান একশো বিয়াল্লিশ ফিটের ডোম বানানো যেত সেটা যেন না দেখলে ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। যদিও ঢোকার মুখে সম্রাট আগ্রিপার নাম লেখা আছে, কিন্তু সম্রাট হেড্রিয়ানই এটাকে সুন্দর ভাবে শেষ করেন। এই প্যান্থিয়নের ভেতরেই শিল্পী রাফায়েলের সমাধি রয়েছে। ডোমের ছাদটা দেখলাম গোল করে কাটা যাতে আলো ঢুকতে পারে, তবে আমরা যখন গেলাম তখন আলোর থেকে বৃষ্টির জলই বেশি ঢুকছিল। দু-হাজার বছর আগেও তারা এত সুন্দর ড্রেনেজের ব্যবস্থা করেছিল যে আজও মেঝেতে এতটুকু জল জমে না। প্যান্থিয়নের ভেতরটা দেখলাম সুন্দর কারুকার্য খচিত স্তম্ভ দিয়ে সাজানো। প্যান্থিয়নে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে বৃষ্টি থামলে আমরা 'পিয়াজা নাভোনা'র দিকে রওনা হলাম।

প্যান্থিয়ন

রোম শহরে যত্রতত্রই বিখ্যাত ভাস্কর বার্নিনির তৈরি ফোয়ারা চোখে পড়ে, 'পিয়াজা নাভোনা'ও তার ব্যতিক্রম নয়। এই বিশাল লম্বাটে স্কোয়ারটি যদিও তৈরি হয় দু-হাজার বছর আগে, তবে বার্নিনি এখানে ফোয়ারাটি করেন ষোলোশো একান্ন সালে। এই ফাউন্টেন অফ ফোর রিভারস-এ দেখলাম চারটে বড় বড় স্ট্যাচুর গা দিয়ে জল পড়ছে, সেগুলি যথাক্রমে ভারতবর্ষের গঙ্গা, ইউরোপের দানিয়ুব, দক্ষিণ আমেরিকার প্লাটা নদী ও ঈজিপ্টের নীল নদকে বোঝানো হচ্ছে।

এরপরে যে স্কোয়ারে গেলাম তার নাম 'পিয়াজা দ্য পোপোলো' অর্থাৎ পিপল স্কোয়ার। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হল একটা বিশাল ওবেলিকস, সেটি সম্রাট অগষ্টস ঈজিপ্টের টেম্পল থেকে তুলে এনেছিলেন। প্রথমে এটা সার্কাস ম্যাক্সিমাসে ছিল, পরে এখানে লাগানো হয়। মাত্র দুশো বছর আগেও এখানে লোকজনের সামনেই আসামীদের হত্যা করা হত।

সেদিনের লাঞ্চ কাছেই একটা রেষ্টুরেন্টে স্প্যাগেটি দিয়ে সারা হল, কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর প্রাচীন রোমের সব থেকে চওড়া রাস্তা 'ভিলা ডেল কোরসো' দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। খেয়াল করলাম এখানে কষ্ট করে হাঁটতে হয় না, মোটামুটি লোকজনের ঠেলাতেই অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায়। রাস্তার দুধারে অজস্র নামীদামী দোকান, কারণ এটা নাকি রোমের ফ্যাশন পাড়া। এই ভাবে লোকজনের গুঁতো খেতে খেতে একসময় আমরা 'স্প্যানিস স্টেপস' পৌঁছে গেলাম।

স্প্যানিশ এম্বাসি কাছে থাকায় রাস্তার ওপর এই সিঁড়িগুলোর লোকে নাম দেয় স্প্যানিশ স্টেপস। দেখলাম জায়গাটা নিউইয়র্কের টাইম স্কোয়ার বা কোলকাতার ধর্মতলার মতনই জমজমাটি। সামনেই বার্নিনির তৈরি ফোয়ারাতে সিংহের মুখ দিয়ে জল পড়ছে আর লোকজন মনের আনন্দে গাইছে - এককথায় বেশ ফুর্তির জায়গা। স্প্যানিশ স্টেপের পাশেই একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ইংরেজ কবি কিটস-এর যক্ষা রোগে মৃত্যু হয়।

এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে প্রায় সন্ধের দিকে ট্রেভি ফাউন্টেন দেখতে গেলাম। ট্রেভি ফাউন্টেনের সামনে দাঁড়িয়ে বহুবছর আগেকার একটা স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠল। এর খুব কাছেই একটা দোকানে জুতো কিনতে গিয়ে আমি বেশ কিছু সোনার গয়না সমেত ব্যাগ ফেলে এসেছিলাম। ইতালির মত জায়গাতে ব্যাগটা ফেরত পাব সে আশা বিশেষ ছিল না, তবুও পরের দিন গিয়ে বর্ণনা দিতে এক সুদর্শন যুবক একটু হেসে ব্যাগটা ফেরত দিয়েছিলেন। আজও দেখলাম তিনি সেই একই দোকানে কাজ করছেন, শুধু তফাতের মধ্যে এখন তাঁর চুলগুলো পুরোটাই সাদা। মনে মনে ভাবলাম আমাকে চিনতে পারলে সেও হয়তো বলত 'তুমিও আগের মত নেই বন্ধু'। আমার মধ্যেও কি আর অতীতে ফেলে আসা সেই চূড়ান্ত অগোছালো হাসিখুশি তরুণীটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে?

পিয়াজা নাভোনা

সতেরোশো বত্রিশ সালে সালভি এই ট্রেভি ফাউন্টেন ডিজাইন করেন, দেখে মনে হয় যেন সমুদ্র দেবতা নেপচুন ঘোড়ায় টানা রথে চেপে জলের মধ্যে দিয়ে ধেয়ে আসছেন। জলটা অবশ্য আসছে দুহাজার বছরের পুরোনো অ্যাকুইডাক্ট থেকে। এই অ্যাকুইডাক্টও রোমানদের আবিষ্কার। বহু দূরের জলাশয় বা নদী থেকে বড় বড় আর্চের ওপর পাইপ বসিয়ে সেই জল তারা শহরে টেনে আনতো। হঠাৎ খেয়াল করলাম বেশ কিছু বাংলাদেশি ছেলে নবদম্পতি ও অল্পবয়সী প্রেমিক-প্রেমিকাদের ফ্রিতে গোলাপ ফুল অফার করছে - দেখে মুগ্ধ হয়ে ছেলেকে বললাম 'দ্যাখ এরা কত ভালো, ফ্রিতে দেবে বলছে।' চটপট জবাব পেলাম যে, গোলাপটা ফ্রি নাকি মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, কারণ গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে ওদের থেকে ছবি না তোলালে সঙ্গে সঙ্গেই হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছে। আমি তো শুনে হাঁ!

ট্রেভি ফাউন্টেন

লোকজন দেখলাম ট্রেভি ফাউন্টেনের ভেতর পয়সা ফেলছে যাতে তারা আবার রোমে ফিরে আসতে পারে। মনে পড়ে গেল বহুবছর আগে আমিও এই ট্রেভি ফাউন্টেনে পয়সা ফেলে প্রার্থনা করেছিলাম যেন আবারও আমি এই রোমে ফিরে আসতে পারি। ফিরে তো আসতেই হবে একবার কেন হয়তো বারবারই ফিরে আসতে হবে, কারণ রোম যে সেই চিরন্তন শহর যা বারবার দেখেও পুরনো হয় না, আজও যে এর আকাশে বাতাসে অ্যান্টনি, ক্লিওপেট্রা ও জুলিয়াস সিজারের মত নায়ক নায়িকারা ঘুরে বেড়ান, দুহাজার বছরেও যাঁদের স্মৃতি এতটুকু ম্লান হয় নি। আজও কল্পনায় রাস্তাঘাটে সেই রণসাজে সজ্জিত রক্তমাখা গ্ল্যাডিয়েটরদের পদধ্বনি শোনা যায় আর পাঁচশো বছর পরেও দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল, বার্নিনি ও মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর মত শিল্পীদের হাতের কাজ দেখতে দেখতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। তাই এবারেও পয়সা ছুঁড়ে আমাকে বলতে হল - 'আবার আসিব ফিরে'।

সেদিনের মত বেড়ানোর ইতি টেনে পরেরদিন সকালেই ভ্যাটিকান সিটির দিকে রওনা হলাম। রোম শহরের মধ্যে এটি একটি সম্পূর্ণ আলাদা দেশ, এমন কী এর পোষ্ট অফিসও আলাদা। অত সকালে উঠেও দেখলাম কোনও লাভ হল না, কারণ ঝাঁকে ঝাঁকে ট্যুরিষ্ট আমাদের অনেক আগেই সেখানে পৌঁছেছেন। যাইহোক বেশ কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর পর ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেলাম। প্রথমেই গেলাম সেন্ট পিটার স্কোয়ারে যেখানে পোপ জনসাধারণকে দর্শন দিয়ে থাকেন। কারণ তার সামনেই সেন্ট পিটার ব্যাসিলিকা। এই পরমশ্রদ্ধেয় সেন্ট পিটার ছিলেন যীশুর সাক্ষাৎ শিষ্য, ক্রুসিফিকেশনের বহু বছর বাদে সেন্ট পিটারের হাড়গোড় কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায় আর সেইগুলিই এই চার্চের ভেতরে স্থান পায়। বিশাল চার্চটি এতটাই সাজানো যে ঢুকে যেন চোখ ঝলসে যায়।

সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার

মার্ক বলে একটি আমেরিকান ছেলে আমাদের খুব যত্ন করে এই চার্চের ভেতরে প্রতিটি জিনিসের মানে ব্যাখ্যা করে বোঝাল আর সত্যি কথা বলতে কী সেদিন এই ছেলেটির সাহায্য না পেলে গাইড বই পড়ে পড়ে পুরো চার্চটা দেখতে কতঘন্টা সময় লাগত ভগবানই জানেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম এই মার্ক আমেরিকার 'ইয়েল' বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টহিস্ট্রি নিয়ে পড়াশুনা করে।

এই ব্যাসিলিকার মধ্যেই মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর তৈরি 'পিয়েটা' দেখতে পেলাম যেখানে মা মেরী মৃত যীশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এই শ্বেতপাথরের ভাস্কর্যটা এতটাই নিখুঁত যে ভাবতে অবাক লাগে মাত্র তেইশ বছর বয়সে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো এটি তৈরি করেছিলেন। শ্বেতপাথরটা এতই পাতলা করে কাটা হয়েছে যে হঠাৎ করে মনে হয় যেন পাতলা সাদা কাপড়ের মধ্যে দিয়ে যীশুর দেহটা ফুটে বেরোচ্ছে। এই তিনশো চল্লিশ

সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ভাস্কর্য পিয়েতা

ফিট চার্চের বিশালতা পুরোটা ক্যামেরায় ধরাও যায় না।

ভ্যাটিকান মিউজিয়ামে রাফায়েল, বার্নিনি, বত্তিচেলি ও মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর মত শিল্পীদের হাতের কাজ দেখতে দেখতে রীতিমত মাথা ঝিমঝিম করে, মনে হয় চোখকে একটু বিশ্রাম দেওয়া ভালো। প্রায় বারো হাজার স্কোয়ার ফিট সিলিং চোখের অত কাছ থেকে এঁকে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। একটা দরজার মুখে দেখলাম সুন্দর নীল বেনারসীর মত চাঁদোয়া ক্লিপ দিয়ে লাগানো। তার বেশ কিছু জায়গা রীতিমত ভাঁজ হয়ে ফুলে থাকাতে ভাবলাম যে লাগিয়েছে সে হয়তো ঠিকভাবে লাগাতে পারে নি। আমি চট করে একটু কাপড়টার গায়ে হাত বুলোতে গিয়ে রীতিমত বোকা বনে গেলাম - কারণ সেটা কাপড় নয়, রং তুলির টানে এমনভাবে আঁকা হয়েছে যে সামনে দাঁড়িয়েও বোঝার উপায় নেই। সিস্টিন চ্যাপেলে সারা সিলিং জুড়ে মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর 'ক্রিয়েশন অফ আদম' ও 'ক্রিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড' দেখতে দেখতেই অনেক সময় কেটে যায়। দেওয়াল থেকে সিলিং যেদিকেই তাকাও শুধু পেন্টিং আর পেন্টিং, কোথাও এক অংশও ফাঁকা নেই।

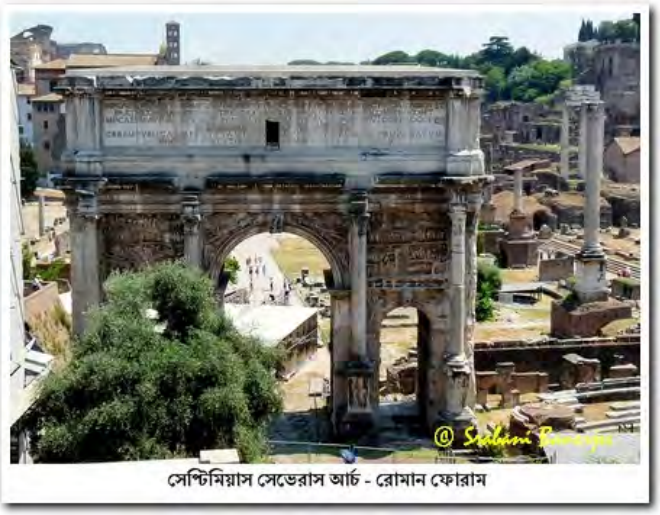

সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস আর্চ - রোমান ফোরাম

পরের দিনের গন্তব্যস্থল ছিল রোমান ফোরাম। যদিও ফোরাম কথাটার মানে বাজার কিন্তু দুটি পাহাড়ের মাঝে এই উপত্যকা ছিল প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্পট। এর একদিকে প্যালাটাইন হিল। যেখানে থাকতেন সম্রাট অগাস্টস। আর অন্যদিকে ক্যাপিটোলাইন হিল। রোমানরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জয় করে এই ফোরামেই সেলিব্রেট করতে আসতো। এখানেই জুলিয়াস সিজার ঈজিপ্টের রানি সুন্দরী ক্লিওপেট্রাকে অভ্যর্থনা জানান। এই ফোরামে ঢোকার মুখেই একটি বিশাল আর্চ চোখে পড়ে, যার নাম টাইটাস আর্চ। সত্তর খ্রিস্টাব্দে জেরুসালেম জয় করার পর সম্রাট টাইটাসের সম্মানে এই আর্চটি তৈরি করা হয়। দুহাজার বছর বাদেও সেই একই জায়গাতে রোমের অতীত গৌরবের সাক্ষী হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেই বিরাট কোর্ট হাউসের ভেতরে দাগী আসামীদের বিচার হত যার বেশির ভাগটাই এখন ধ্বংস। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের কিছু কিছু আইন এখনও চালু আছে। বিশাল আকারের ভেস্টাল মন্দিরটা আজও পরিষ্কার বোঝা যায়, যেখানে প্রাচীন রোমের নিয়মানুযায়ী ছটি কুমারী মেয়ের কাজ ছিল সারাক্ষণ রোমের পবিত্র আগুনটা জ্বালিয়ে রাখা। এই ফোরামে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বণিকরা হীরে, মুক্তো ও সিল্কের জামা কাপড় বিক্রি করতে আসত। এখানেই সিনেট হাউসে সাদা কাপড় অর্থাৎ টোগা পরে অন্যান্য সিনেটারদের সঙ্গে জুলিয়াস সিজারও কাজে আসতেন। এই ফোরামই ছিল প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু।

অনেকেরই ধারণা যে জুলিয়াস সিজারকে এই রোমান ফোরামের মধ্যেই সিনেট হাউসের সামনে হত্যা করা হয়। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। এই বিল্ডিংটা সেই সময়ে সারানো হচ্ছিল তাই সেদিনের সিনেটের মিটিং ডাকা হয় পম্পে থিয়েটারে। পরে তার মরদেহ এই রোমান ফোরামে নিয়ে এসে দাহ করা হয়। শোনা যায় পরমপ্রিয় ও শিষ্য ব্রুটাসের ছুরির আঘাত সহ্য করতে না পেরে তার মুখ দিয়ে সেই অন্তিম বাক্য বেরিয়ে এসেছিল - "এ ত্যু ব্রুত?" অর্থাৎ ব্রুটাস তুমিও? সেই জায়গায় অর্থাৎ টেম্পল অফ সিজারে ঢুকে দেখলাম আজও লোকজন তাঁর সম্মানে ফুল রেখেছেন। জানি না কেন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি হল, মনে হল গোটা ফোরামটা যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। যেন সামনেই দেখতে পেলাম জুলিয়াস সিজারকে দাহ করা হচ্ছে আর উন্মত্ত জনতা ক্ষেপে গিয়ে ফোরামের চতুর্দিকে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। তাদের প্রিয় নেতাকে যারা খুন করেছে তাদের শেষ না দেখে জনতা ছাড়বে না।

বেশ কিছুক্ষণ বোধহয় ঘোরের মধ্যেই ছিলাম, তাই হঠাৎ পায়ে একটা নরম কিছুর স্পর্শ পেয়ে যেন স্বপ্নভঙ্গ হল। তাকিয়ে দেখি একটা হৃষ্টপুষ্ট বেড়াল আমার পায়ে মাথা ঘষছে। হায় কোথায় সিজার আর কোথায় এই বেড়াল! বাস্তব বড় কঠিন ঠাঁই, এরই পূর্বপুরুষ হয়তো জুলিয়াস সিজারের অতি আদরের বেড়াল ছিল সেই ভেবে তার গলা চুলকে আবার হাঁটা শুরু করলাম।

এইভাবেই হাঁটতে হাঁটতে প্যালাটাইন হিল-এ সম্রাট অগাস্টস-এর বাড়ির কাছে চলে এলাম। যদিও বাড়িটা এখন অনেকটাই ধ্বংস তবুও তার সাইজ দেখে মনে হল অগাস্টস বেশ সাদামাটা ভাবেই থাকতেন। এর খুব কাছেই অগাস্টস-এর তৈরি সার্কাস ম্যাক্সিমাস, যেখানে দুহাজার বছর আগে আড়াই লক্ষ লোক বসে খেলা দেখতে পারতো। এখানেই বিখ্যাত চ্যারিয়ট রেস ও গ্ল্যাডিয়েটরদের যুদ্ধ দেখানো হত যার বেশির ভাগটা ধ্বংস হয়ে গেলেও কিছুটা অংশ আজও পরিষ্কার দেখা যায়।

রোমান বাথ-এর কথা এত শুনেছিলাম যে এরপর সোজা চলে গেলাম কারাকালা বাথ দেখতে। রোমানরা বাথরুম বলতে কী বোঝাতো সেটা জানতে হলে অবশ্যই একবার কারাকালা বাথ দেখতে যাওয়া উচিৎ। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যতটুকু গোটা আছে সেটা দেখলেও বিস্ময় লাগে। এটা বাথরুম নাকি একটা ছোটখাটো শহর ছিল সেটাই বোঝা ভার! প্রায় ষোলশো লোক এখানে একসঙ্গে স্নান করতে পারতো। এটা শুধু স্নানের জায়গাই ছিল না, এর ভেতরে লাইব্রেরি এমনকি আর্ট গ্যালারি পর্যন্ত ছিল, যেখানে নাকি নিয়মিত নাটক দেখানো হত। স্নানের জন্য চতুর্দিকে বড় বড় ফোয়ারা ছিল যেখানে কোথাও গরম আর কোথাও বা ঠান্ডা জল বার হত। সুইমিং পুলের চতুর্দিকে মোজাইকের কাজ দেখে আজও কেমন বিস্ময় লাগে। ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে জানা যায় এখানে ভালো লোকের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র পকেটমার ঘুরে বেড়াত, এছাড়াও হকাররা তাদের জিনিস বিক্রির জন্য একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জোরে জোরে হাঁক পাড়ত। খাবারের দোকান থেকে মাসাজ পার্লার সবই এই কারাকালা বাথের মধ্যে ছিল। ভাবতে খারাপ লাগে এইসব সুন্দর জিনিস তৈরি করতে কত সময় লাগে অথচ দস্যুদের হাতে ধ্বংস হতে মাত্র একদিন।

ভাবছিলাম আজও তো সারা পৃথিবীতে রোমান হরফ শেখানো হয় তাই আমিও প্রতিটি বিল্ডিং, মন্দির ও সৌধের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে পারছি

কারকালা বাথের বাইরে

কবে বা কখন তারা তৈরি হয়েছিল আর লাতিন ভাষায় আজ কেউ কথা না বললেও সারা ইউরোপের সব ভাষার মধ্যেই তো তা ছড়িয়ে আছে। স্প্যানিশ ও পোর্তুগিজ ভাষার মধ্যে লাতিন ভাষার প্রভাব এতটাই যে আজও দক্ষিণ আমেরিকাকে লোকে লাতিন আমেরিকা বলে ডাকে। জুলিয়াস সিজারই প্রথম বারোমাসের সৌর ক্যালেন্ডার তৈরি করেন। কখনও কী চিন্তা করে দেখেছি এখনও আমাদের সোলার সিস্টেমটা রোমান দেবতাদের নামে চলছে - যথাক্রমে মার্কারি, ভেনাস, মার্স, জুপিটার, স্যাটার্ন, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো!

অতীতের ইতিহাসে এতটাই বিভোর ছিলাম যে বুঝি নি কতটা সময় কেটেছে, হঠাৎ ছেলের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলাম, তার নাকি অত্যন্ত ক্ষিদে পেয়েছে। সত্যিই তো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা তিনটে। ভাবলাম এখান থেকে বেরিয়ে সামনেই যে রেষ্টুরেন্ট পাব তাতেই ঢুকব। এখানে এসে একটা জিনিস খেয়াল করেছিলাম, এদের অনেক কথাই 'ও' তে শেষ হয়। যেমন অ্যান্টনি হয় আন্তোনিও, লরেন্স হয় লরেঞ্জো, এছাড়াও ভ্যালেন্তিনো, অ্যাঞ্জেলো ও লিওনার্দোরা তো আছেনই। হোটেলের গায়ে লেখা থাকে কম্প্লিতো অর্থাৎ ভর্তি। কোথাও লেখা 'ভ্যালিদো' আর কোথাও 'প্রাইভেতো'। ট্রেনের গতির উপর নির্ভর করে কেউ হয় 'এক্সপ্রেসো', কেউ 'র‍্যাপিদো' আর কোনওটা বা 'দিরেকতো'। রাস্তায় একজনকে রেষ্টুরেন্টের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি সামনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে বললেন 'স্ত্রেতো' অর্থাৎ সোজা গেলেই পেয়ে যাবে।

সিস্টিন চ্যাপেলের সিলিং-এর অলঙ্করণ

কথাতেই আছে 'হোয়েন ইন রোম ডু, অ্যাজ দ্য রোমান ডু' তাই আমিও সোজা রেষ্টুরেন্টে ঢুকে বললাম "ওয়ানো কফিও", লোকটা শুনে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে বলল "নো ওয়ানো - উনো।" যাক্ বাবা কাছাকাছি তো গেছি, ওয়ানো আর উনোতে কতটুকুই বা তফাৎ? চিরতার মত তেতো আর কড়া কফি খেয়ে শরীরের সমস্ত স্নায়ু বেশ চনমনিয়ে উঠল। ছেলেকে পিৎজা খেতে দেখে আমি আর মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বার না করে দু'স্লাইস বোঝাতে দুটো আঙ্গুল তুলে সামনে রাখা পিৎজাটা দেখিয়ে দিলাম। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল দুয়ে? কি আশ্চর্য! এরা কি বাংলাও বলে নাকি? তারপরেই বুঝলাম দুই হলে দুয়ে।

'নি' তে শেষ হওয়া শব্দও দেখলাম খুব বেশি পেছিয়ে নেই। ডিকটেটর মুসোলিনি থেকে ডিজাইনার আরমানি - কারোর দাপটই কিছু কম নয়। বার্বেরিনি প্লাজাতে গিয়ে বার্নিনির ফাউন্টেন দেখে এলাম। ভেতরে হ্যাম ভরা স্যান্ডউইচের নাম পানিনি আবার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা রেষ্টুরেন্টের নাম পাপিনি। হঠাৎ করে নিজের নামটাও কানে বেশ ইতালিয়ান ইতালিয়ান ঠেকল - তাই সেদিন ডিনারে পাস্তার অর্ডার দিতে গিয়ে মেনুকার্ডে 'তরতেলিনি', 'কাল্‌চোনি' ও 'ফেতুচিনি'দের দেখে আমি এই 'শ্রাবণী'-ও কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।

এইভাবেই রোমে চারটি দিন যেন স্বপ্নের মত কেটে গেল। দ্বিতীয়বার এসেও মনে হল হাতে আর একটু সময় নিয়ে এলেই ভালো হত। এই রোমের আকর্ষণ এতটাই যে বারবার দেখেও পুরোনো হয় না। অতীতের জুলিয়াস সিজার ও মার্ক অ্যান্টনির দল আজও রোমের মাটি দাপিয়ে বেড়ান। রাফায়েল, বত্তিচেলি, বার্নিনি ও মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর মত শিল্পীদের হাতের কাজ দেখতে দেখতে যেন আর্টের বদহজম হয়ে যায়, তাই সেজেগুজে সন্ধেবেলা একটা ইতালিয়ান অপেরা দেখতে গেলে সেটা যেন অনেকটা অ্যান্টাসিডের কাজ করে। প্রতিদিন পৃথিবীবিখ্যাত ইতালিয়ান কুইজিনে খাওয়ার পয়সা না থাকলে পিৎজার জন্মস্থানে এক স্লাইস পিৎজা নিয়ে রাস্তায় বসে পড়তেই বা বাধা কোথায়?

এক কথায় রোমকে একাধারে খাদ্যরসিক, ইতিহাস প্রেমিক ও আর্ট লাভারদের স্বর্গ বললে অত্যুক্তি হয় না।

আর্চ অফ কনস্ট্যান্টাইন

~ *রোমের আরও ছবি* ~

শ্রাবণী ব্যানার্জীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গীতচর্চা ও ইতিহাস পাঠে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। কৌতূহল এবং আনন্দের টানেই গত কুড়ি বছর ধরে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত করে বেড়াচ্ছেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com *অথবা* amaderchhuti@gmail.com *-এ।*

মাড়াই-এর জঙ্গল মাড়িয়ে

অভিজিৎ কুমার চ্যাটার্জি

~ *সাতপুরা টাইগার রিজার্ভের আরও ছবি* ~

নদীর সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, আচ্ছা স্কাইলাইনের এর বাংলা কী? ... দিগন্ত নাকি আকাশরেখা?
ঘুম থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে একমুঠো মিষ্টি রোদ।
ঘুমন্ত রাজকন্যার মতো এই পাহাড় নদীকে দুচোখ ভরে দেখি শুধু। শঙ্কায় হাত ছোঁয়াতে পারিনা!
স্বাধীনতা কী অপার! এ তো, সৃষ্টির ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার চেতনা! এই ভীষণ স্বাধীনতা থেকে চোখ ফিরিয়ে নি কী করে! আচ্ছা, পাহাড়ের সংখ্যা কি সাত? নামতো তাই "সাতপুরা"!
তাওয়া নদীর ব্যাকওয়াটার - জায়গাটার নাম মাধাই, স্থানীয়রা বলেন "মাড়াই", ভূপাল থেকে মাত্র ১৪০ কি মি। আমরা অবশ্য এসেছি নাগপুর থেকে, দূরত্ব ২৯৩ কি. মি., সময় লেগেছে পাঁচ ঘন্টার মত। সাতপুরা ন্যাশনাল পার্ক-এর মধ্যে অবস্থান - যদিও বর্তমানে এটি টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট-এ উন্নীত হয়েছে।
মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম এর নতুন ঠিকানা - 'বাইসন রিসর্ট' - একদম ডেভোয়া নদীর ধারে। নদীর ওপারেই জঙ্গল আর পাহাড়ের হাতছানি!

লঞ্চে চেপে জঙ্গল দেখা আর সিনেমার জঙ্গল দেখা প্রায় একই রকম। বনদপ্তরের লঞ্চে করে নদী পার করে এসে দাঁড়ালাম 'সাতপুরা ন্যাশনাল পার্ক'-এর দোরগোড়ায়।

অরণ্যে এসে অনেক সময়ই অরণ্য দেখাই হয় না। ছেলেমানুষের মতো শুধু জন্তু-জানোয়ার দেখার ইচ্ছেই জাগে - উঠে পড়লাম জিপসিতে। পিচসড়ক ছেড়ে জিপসি ঢুকল আলোছায়ামাখা অরণ্যে পথে।

অরণ্য সবুজ, কিন্তু সবুজ মোটেই একটা রং নয়, অন্ততঃ সাত রকম সবুজ তো রয়েছেই এই জঙ্গলে।

জিপসি একটা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। চুপ করে শুনি জঙ্গলের শব্দ - বোঝার চেষ্টা করি ওর ভাষা!
আসলে ক্ষমা আর তাচ্ছিল্যের একটা রাজকীয়তা থাকে, সব বিরুদ্ধতাই তো উত্তরের যোগ্য হয় না - জঙ্গল যেন সে কথাই মনে করিয়ে দেয়।
গুনগুন করে উঠি...
"The woods are lovely, dark and deep,
But I have to promise to keep
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep..."

গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত আলো ঢুকে জীপ চলার রাস্তাকে কী ভীষণ রোমান্টিক করে তুলেছে! প্রকৃতির মতো বড় সিনেমাটোগ্রাফার আর হয় নাকি?
গাছপালা বলতে মূলতঃ বাঁশঝাড়, সেই সঙ্গে টুকটাক সেগুন, শাল, বহেরা - এই সব আর কী! তবে সব গাছ যে চিনি, তা তো আর নয়। মাঝে মধ্যেই রয়েছে বিস্তীর্ণ ঘাসজমি।
গাইডের ডাকে সম্বিৎ ফিরল, বাঘ নাকি! দেখি বন থেকে বেরিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে একদল চিতল হরিণ। আর দূরে দাঁড়িয়ে আছে কালো পাথরের মতো পিঠ নিয়ে একজোড়া ইন্ডিয়ান বাইসন!
গাইডের চোখ কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে!

প্রতিটা মুহূর্তেই যেন কী একটা ঘটবে তার নিঃশব্দ উত্তেজনা।

চোখে পড়ল একদল সম্বর। গাইড বলল, 'ঝুন্ড' - সম্বরের দল। বারো চোদ্দোটা তো হবেই!
সময় তখন বিকেল আর গোধূলির পাকদন্ডিতে আটকে। ক্যামেরায় মেমোরি কার্ডে ধরা স্মৃতির চেয়ে অনেক বেশি মুহূর্ত চোখের ক্যামেরায় ধরে, মনের মনিকোঠায় ডেভেলাপ করে, চিরতরে স্মৃতির অ্যালবামে রেখে, এভাবেই ঘরমুখী আমরা। 'জঙ্গল' মানে বন্যজন্তুদের সুখের বাসর, নিশ্চিন্ত নীড়। বাঘ দেখার মাদকতা, থাক না বেঁচে, পরের বারের জন্য!

বর্ষাকাল বাদ দিয়ে সারাবছরই যাওয়া যায় মাড়াইয়ে, তবে যাওয়ার আগে পার্ক খোলা আছে কিনা দেখে নেওয়াই ভালো। পাঁচমাড়ি গেলে

অবশ্যই জুড়ে দেবেন মাত্র ৮০ কিমি দূরে জঙ্গলের এই নতুন ঠিকানা।

~ *সাতপুরা টাইগার রিজার্ভের আরও ছবি* ~

পেশাগত ভাবে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার অভিজিৎ কুমার চ্যাটার্জীর নেশা ভ্রমণ। নেশার তাগিদে ঘুরে বেড়িয়ে নির্মাণ করেন পর্যটনকেন্দ্রগুলি নিয়ে নানান ট্রাভেল ডকুমেন্টারি।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

অজানা খমকুট ড্যাম

সেখ মহঃ ওবাইদুল্লা

সময়-সুযোগমত মাঝে মাঝেই এদিকে ওদিকে বেড়িয়ে পড়ি। এবারের দেওয়ালি আর কালীপুজোর ছুটিতে গন্তব্য ছিল ওড়িশার পঞ্চলিঙ্গেশ্বর আর চাঁদিপুর। শনিবার সকাল ছটায় হাওড়া থেকে নির্ধারিত সময়ে ধৌলি এক্সপ্রেস ছাড়ল। বালাসোর পৌঁছালাম বেলা সাড়ে নটা নাগাদ। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়েই অটো পেয়ে গেলাম ওড়িশা ট্যুরিজম-এর পঞ্চলিঙ্গেশ্বর পান্থনিবাসে পৌঁছানোর জন্য। পথের দুধারের দৃশ্য খুবই মনোরম, দু চোখ জুড়িয়ে যায়। পান্থনিবাসের অবস্থানটি ভারী সুন্দর জায়গায় - সামনেই স্বল্প উচ্চ নীলগিরি পাহাড়, পাথরের সারিগুলো দেখলে মনে হয় কেউ যেন খুব যত্ন করে থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে।
টিফিন সেরে বেরিয়ে পড়লাম চারদিকটা একটু ঘুরে দেখতে। জায়গাটা এখনও তেমন জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পটের মধ্যে পড়ে না, খুব বেশি হোটেল চোখে পড়ল না। মূলত আদিবাসী মানুষদের বাস, দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট, চাষ আবাদ আর পশুপালনই প্রধান জীবিকা। এখানে যাঁরা আসেন পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের উদ্দেশ্য নিয়েই আসেন। নীলগিরির ওপরে অবস্থিত একটি ধর্মস্থান। প্রায় তিনশো এগারটি সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছাতে হয় সেখানে। একটু কষ্টকর, কিন্তু ওপরে উঠতে পারলে বেশ ভাল লাগে।
এখানে আসার আগে এক পূর্বপরিচিতের কাছে শুনেছিলাম খমকুট ড্যাম-এর কথা। পান্থনিবাস থেকে দূরত্ব চার কিমির মত, গাড়ি করে যাওয়া যায় আদিবাসী গ্রামের ভেতর দিয়ে। আর একটা রাস্তা আছে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর-এর পাশের জঙ্গল দিয়ে, যেটায় আড়াই কিমি মতো দূরত্ব। কিন্তু দ্বিতীয় পথটি গাইড ছাড়া যাওয়া খুব বিপজ্জনক, ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ি রাস্তা, হাতি আর ভাল্লুকের ভয় তো আছেই, তার সঙ্গে আছে রাস্তা হারানোর বিপদও। সেদিন বিকেলে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর ঘুরে আসার পর সময়ের অভাবে খমকুট দেখতে যাওয়া আর হল না। গাড়ি করে য়াওয়ার সময়টা ছিল, কিন্তু ইচ্ছা করছিল জঙ্গল পথ ধরে যাওয়ার জন্য।

পরদিন খুব সকাল সকাল হাঁটতে বেরিয়ে পান্থনিবাসের কাছে দুজন স্থানীয় বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পেলাম। ওদেরকে বলতেই রাজি হয়ে গেল। কিছু টাকার বিনিময়ে জঙ্গলপথে খমকুট নিয়ে যাবে। পান্থনিবাস থেকে একই পথে পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে ওঠার সিঁড়িগুলো যেখানে আছে, তার একটু আগে পর্যন্ত গেলাম। তারপর বামদিকে একটা ঢালু পথ চলে গেছে জঙ্গলের দিকে, সেই পথ ধরলাম। খুব সকালে বেরিয়েছি, রাস্তায় মানুষজন প্রায় নেই বললেই চলে, যা কয়েকটা দোকানপাট আছে (প্রধানত পুজো দেওয়ার ডালি বিক্রি হয় আর দুয়েকটা চায়ের দোকান) তাও বন্ধ। কিছুটা যাওয়ার পর বাঁহাতে একটা ভাঙা বাড়ি চোখে পড়ল। জিজ্ঞেস করতে আমার এক গাইড বলল, আগে ফরেস্ট অফিস ছিল, এখন অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে, তাই এই ভগ্নদশা। বাকি পথ পুরোটাই প্রায় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, পাশে নীলগিরি পাহাড়, কয়েকটা আদিবাসী কুটিরও চোখে পড়ল। জঙ্গলের পশুদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য

ক্যাকটাস জাতীয় কাঁটা গাছ লাগানো বাড়িগুলোর চারপাশে, পরিবেশ বান্ধব সুরক্ষা বলা যায় আর কী। পাশে একটা তারের বেড়া জাতীয় দেওয়া আছে, ওগুলোতে নাকি রাতে ইলেক্ট্রিক সংযোগ করা থাকে সুরক্ষার জন্য। প্রায় মিনিট কুড়ি চলার পর একটা খুব ঢালু খাদের মতো জায়গায় নামতে হল বেশ কষ্ট করে, তারপর আবার অনেকটা চড়াই। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম একটা উঁচু বাঁধের মতো জায়গা।

তীব্র ক্লান্তি নিয়ে ওঠার পর যা দেখলাম তা এক কথায় অনির্বচনীয়। চারদিকে জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা এক সরোবর, দু চোখ জুড়িয়ে গেল যেন। সরোবরের মাঝে একটা ছোট মন্দির আর একটা নজরমিনার দেখতে পেলাম। জায়গাটি এতটাই সুন্দর যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সরোবরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা যায়। ড্যামটি সেরকম বড় কিছু নয়, সরোবর আর তার অবস্থানটা এতটাই সুন্দর যে তা বর্ণনার অতীত।

বেলা গড়িয়ে আসছিল। ইচ্ছে না থাকলেও ফিরে আসার জন্য সেই বনপথে আবার পা বাড়াতে হল।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষক সেখ মহঃ ওবাইদুল্লা ভালোবাসেন ভ্রমণবিষয়ক লেখা পড়তে, চেনা অচেনা জায়গায় ঘুরতে আর ছবি তুলতে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend